পুরানো দিনের হাইলাকান্দি

বিজয়কুমার ধর

Scanned with CamScanner

পুরানো দিনের হাইলাকান্দি

বিজয় কুমার ধর

Scanned with CamScanner

Purano Diner Hailakandi
A short historical account of Hailakandi town before independence.
Bijoy Kumar Dhar

ISBN 978-93-81911-06-8

পুরানো দিনের হাইলাকান্দি
বিজয় কুমার ধর

স্বত্ব ঃ লেখক

প্রথম প্রকাশ
৩১ জানুয়ারি ২০১৩
১৭ মাঘ ১৪১৯

সাহিত্য প্রকাশনীর পক্ষে
শিখা ভট্টাচার্য কর্তৃক
সাহিত্য প্রিন্টার্স, কলেজ রোড, হাইলাকান্দি, আসাম
থেকে মুদ্রিত ও সাহিত্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

Scanned with CamScanner

পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব যতীন্দ্র মোহন ধর
পরম শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবী হিরণবালা ধর
বড়দা শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার ধর

ও

হাইলাকান্দির জনপ্রিয় সমাজসেবক সন্তোষ কুমার রায়

তাঁদেরই স্মৃতির উদ্দেশে

Scanned with CamScanner

মুখবন্ধ নয়, সবিনয় নিবেদন

আমাদের অগ্রজ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, শ্রী বিজয়কুমার ধর অর্ফ ভানুদা (অতঃপর 'ভানুদা' নামটিই আসবে) পুরনো হাইলাকান্দির ইতিহাস-সংক্রান্ত বইটির পাণ্ডুলিপি আমাকে পাঠিয়ে এর মুখবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। অনুরোধ না বলে আদেশ বলাই শ্রেয়, কেন না, যে ভানুদা এক বহুগুণান্বিত সামাজিক কর্মী—কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে ফুটবলের কর্মশালা এবং তাদের মাঝখানে অবস্থিত কিছু বিষয়ে যাঁর নিরলস সংযুক্তি আমাকে সদাই বিস্মিত করে, তিনি আবার অনুরোধ করবেন কেন? আমি ভানুদার প্রবল অনুরাগী, তাঁর যে-কোনো নির্দেশ পালনে মানসিকভাবে সবসময়ই প্রস্তুত।

ভানুদার পাণ্ডুলিপিতে হাইলাকান্দি শহরের পত্তন থেকে ১৯৪৭ অবধি ইতিহাসের নানা কথা রয়েছে। বহুকাল ধরে প্রায় স্থায়ীভাবেই আমি হাইলাকান্দি ছাড়া, তাই বলেই বোধ হয় হাইলাকান্দি স্থান নামটি শ্রবণে ও দর্শনে আমার মনে ও মগজে এক বিস্ময়কর ঝংকার তোলে। রক্তচলাচল বেড়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। এমন অনুভব বা অভিজ্ঞতা আমার মতো অনেক 'নির্বাসিতে'র হয়তো হয়েছে বা হয়, কিংবা হবে। শৈশবের হাইলাকান্দিকে ভুলতে পারি না বলেই 'সেই সকাল' বলে আমিও একখানা বই লিখেছি, তবে তা ভানুদার বইটির মতো ইতিহাসের দাবি মেটাতে অক্ষম। সেই বইতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবই এবং সেই সঙ্গে হয়তো আবেগই প্রধান।

ভানুদার বইটি অনেক আগ্রহ নিয়ে আমি পড়েছি এবং অনেক অনেক অজানা কথার মাঝখান দিয়ে অতীত হাইলাকান্দিকে কাছে খুঁজে পেয়েছি। আমি জানি, শহরের সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্রের বড়োই অভাব, অনেক বয়স্ক মানুষকে দেখেছি—অতীত কথায় তাঁদের রুচি নেই, পুরনো কথা দাগ কাটেনি তাঁদের মনে, মেমোরি লেনে দেখা মেলে না পুরনো ঘটনা বা চরিত্রের। এই অসাড়তার মাঝখানে থেকে ভানুদা কোন 'দৈব'বলে আমাদের এতো যে সংবাদ দিলেন, বিস্মিত হলাম। আমরা সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বলতে দ্বিধা নেই—হাইলাকান্দির ইতিহাস বিবৃতিতে তিনিই ভগীরথ। পুরনো তথ্যভিত্তিক আর কেউ অনুরূপ কাজ করেছেন বলে জানি না। ধান ও চা, নদী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তথ্য তুলে আনতে নিরলস ও নিরাসক্ত থেকেছেন, তাই তাঁর প্রতিটি

Scanned with CamScanner

কথাই ইতিহাসের মর্যাদা পাবে। শহরে যাঁরা মান্য পুরুষ ও নারী, যাঁরা একসময়ে আলো দেখিয়েছেন ছোট্ট শহরের সামাজিকদের, তাঁদের কথাও রয়েছে ভানুদার বইতে।

উৎসে তথ্যাল্পতা বা রক্তাল্পতা সত্ত্বেও ভানুদা আমাদের ভালোবাসার শহরের ইতিহাস লিখেছেন, আমাদের অতীতকে তুলে ধরেছেন পরম শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায়, এতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অভিভূত।

ইতিহাস চর্চায় শেষকথা বলে কোনো কথা নেই। হাইলাকান্দির পুরনো ইতিহাস সংবলিত এই বইটি থেকে প্রেরণা পেয়ে নতুন কোনো অনুসন্ধানী যদি আরও কোনো আবৃত তথ্যের বিবরণ দিতে পারেন সে হবে পরম আনন্দের।

হাইলাকান্দিবাসী, হাইলাকান্দিপ্রেমিক তথা স্থানীয় ইতিহাস প্রেমিকরা, বইখানি পড়ুন, পড়ান—আপনাদের কাছে এটুকুই সবিনয় নিবেদন।

১.১.২০১৩ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

Scanned with CamScanner

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শ্রী বিজয়কুমার ধর এই অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন-এর সূচনাপর্ব থেকে জড়িত এবং বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যখন ছিলেন, তখন 'সম্মেলন' এর উদ্যোগে ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ পালন করা হয় এই উপত্যকায় এবং বিভিন্ন স্থানের বহু অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হয়। পরে তিনি সম্মেলনের সভাপতির পদও অলংকৃত করেন। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ পালনের সময়ই তিনি অনুভব করেন হাইলাকান্দির প্রাক্ স্বাধীনতা কালের সমাজ-সংস্কৃতির একটা চিত্র উন্মোচন হওয়া আবশ্যক এবং এ সম্পর্কে নানা সময়ে আলোচনাও করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

১৮৬৯ সালে গঠিত আসামের অন্যতম প্রাচীন মহকুমা, ১৯৮৯ সালের ১ অক্টোবর জেলায় উন্নীত হয়, তার সামগ্রিক ইতিহাস নিয়েও বিশেষ চর্চা হয়নি। উপেন্দ্র চন্দ্র গুহের কাছাড়ের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড়ের হাইলাকান্দির কিছু বিবরণ রয়েছে। দেবব্রত দত্তের কাছাড়ের ইতিহাসেও ডিস্ট্রিক্ট গেজেট নির্ভর ইংরাজ আমলের কিছু কাহিনি অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-খেলাধুলো, রাজনীতি সহ প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে নাড়াচাড়া বিশেষভাবে হয়নি। অগ্রজপ্রতীম শ্রী বিজয়কুমার ধর এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং ঐ সময়ের ইতিহাসের উপাদানের খসড়া প্রস্তুত করেছেন, যা বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বিশেষত ইংরাজ শাসনকালে হাইলাকান্দির সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-খেলাধুলো, রাজনীতির পরিমণ্ডলে যেসব কুশীলব জড়িত ছিলেন এবং তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একটি রূপরেখা বর্তমান পুস্তিকায় রয়েছে, যার মাধ্যমে ঐ সময়কালের একটি চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

আশা করি উক্ত পুস্তিকার ভিত্তিতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা আগামীতে এ জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে উৎসাহ পাবেন।

নীতিশ ভট্টাচার্য

সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

Scanned with CamScanner

লেখকের কথা

হাইলাকান্দি শহরে জন্ম আমার। এখানকার মাটি, জল, আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছি। শহরে লোক সংখ্যা খুবই কম ছিল—বিশেষ করে দেশ ভাগের আগে। পাকা বাড়ি, গাড়ি প্রায় ছিলই না। হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে গিয়েছি—শীতে খদ্দরের চাদর পরে রাস্তায় বেরিয়েছি—যাত্রা-থিয়েটার দেখেছি। স্যুট-বুট-টাই দেখাই যেত না। উকিল-মোক্তাররা ধুতি আর কালো কোট পরে কোর্ট কাছারি করতেন। বড় হয়ে জানতে চাইলাম—হাইলাকান্দি শহরের গোড়ার কথা—কোনও বই পেলাম না, দুঃখ পেলাম—এমন একটা পুরোনো শহরের ইতিহাস কেউ লিখে গেলেন না। লেখক নই, সাহিত্যচর্চাও বিশেষ করি না—ভাবছি কী করা যায়। মনের অদম্য ইচ্ছেটাকে কীভাবে পরিপূর্ণ করা যায়। স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম পুরোনো হাইলাকান্দির গোড়াপত্তনের তথ্যাদি—এখানকার সামাজিক ব্যবস্থাদি, লোকজনের অবস্থা ইত্যাদি জোগাড় করে—বই আকারে বের করতেই হবে। লেগে গেলাম তথ্যাদি জোগাড় করতে। কিন্তু বাধা অনেক—লিখিত পত্রপত্রাদির খবর জানি না—এঁকে ওঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে লাগলাম ইতিহাসের তথ্যাদি। এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি আমি নিজেও গবেষক নই—খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। প্রবন্ধকারদের লেখা বই থেকে কিছু কিছু বিষয় জানতে পারলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্যাদি আহরণ করে সেগুলিই পর পর সাজিয়ে বইয়ের আকার দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাঁচা হাতের লেখা তাই হয়তো সুখপাঠ্য হবে না তবে ইতিহাসের পাতা ভরতে পারা যাবে তো। তবু তো একটা রেকর্ড থাকবে—এটাই বা কম কিসে। বইটি লিখতে অনেক ম্যাগাজিন, বই বা অনেক বিদ্বজ্জনের সাহায্য নিয়েছি, তাঁদের নামের তালিকা এখানে উল্লেখ করলাম না—কারণ তা করতে গেলে অনেকের নাম হয়তো বাদ পড়ে যাবে। যাঁদের সাহায্য আমি পেয়েছি তাঁদের কাছে আমি ঋণী—তাঁদের সেজন্যই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। বইটির ভূমিকা লিখে প্রখ্যাত সাহিত্যিক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অপরিপক্ব হাতে লেখা বইয়ের জন্য পাঠককুলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

বিজয়কুমার ধর

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি নামের উৎপত্তি

আসামের পুরাতন মহকুমাগুলির মধ্যে হাইলাকান্দি মহকুমা অন্যতম। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন হাইলাকান্দি মহকুমায় উন্নীত হয়। হাইলাকান্দি নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু মতবাদ এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে—

মতবাদ (১) অতি প্রাচীনকালে বরাক উপত্যকায় কুকি জাতীয় লোকের বাস ছিল — বিভিন্ন দলপতির অধীনে এসব লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিল। হাইলাকান্দি অঞ্চল ছিল 'হলাম' জাতীয় কুকিদের অধীনে। কুকি ভাষায় 'হলা' শব্দের অর্থ ঈশ্বর এবং 'কুন্দী' শব্দের অর্থ পরমপুরুষ অর্থাৎ শিব। হলাকুন্দীর অর্থ পরমপুরুষ শিব এবং এর থেকেই পরবর্তী কালে কাছাড়ি রাজাদের আমলে নাম হয় হল্লাকুন্দি। ইংরেজদের শাসনকালে 'হাইলাকন্দি' নামে পরিচিত হয়। হাইলাকান্দি জেলার প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানতে পারি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর থেকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পৌরাণিক কাহিনীতে কুকিদের কিরাটো বা ম্লেচ্ছ বলে উল্লেখ আছে।

মতবাদ (২) হাইলাকান্দি জেলায় প্রাচীনকালে শাইলধান প্রচুর ফলত — অনেকের মতে এই শাইল ধানের নাম থেকেই জায়গাটির নাম প্রথমে শাইলাকান্দি ও পরে হাইলাকান্দি নাম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ অঞ্চলের লোকেরা 'শ' কে 'হ' এর মত উচ্চারণ করেন। তাই শাইলাকান্দি না হয়ে তা হাইলাকান্দি হয়েছে বলে মনে করা হয়। জানি না ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ কী?

Scanned with CamScanner

মতবাদ (৩) বর্তমান হাইলাকান্দি শহরের পশ্চিম অংশকে বরইবাড়ি বলা হত। এ অঞ্চলটি ছিল ইপারা রাণি হেলীর জমিদারি। তারই নামানুসারে প্রথমে 'হেলীরকান্দি', পরবর্তীকালে হেলিয়াকান্দি থেকে হাইলাকান্দি।

মতবাদ (৪) আমাদের এ অঞ্চলে ধানক্ষেতের জমিতে জল ধরে রাখার জন্য জমিতে উঁচু করে মাটির বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়—এদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'আইল' বলে। কাছাড়িদের ভাষায় খান্দি মানে অস্থায়ী জমি— দুটো মিলিয়ে আইলাকান্দি বা হাইলাকান্দি নামের উৎপত্তি। বরাক উপত্যকায় কান্দি-যুক্ত অনেক স্থাননাম আছে— যেমন পাথারকান্দি, সুপ্রাকান্দি, মর্যাদকান্দি ইত্যাদি।

উল্লিখিত মতবাদগুলো সবকটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তবু ঐতিহাসিকদের চক্ষে প্রথম মতবাদটার গ্রহণযোগ্যতা বেশি বলেই সবাই মনে করেন।

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি শহরের ভৌগোলিক অবস্থান

হাইলাকান্দি ২৪°৪৬′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২°৩২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সমুদ্র সমতল থেকে ৮১.৩ মিঃ উচ্চে অবস্থিত। শহরের মধ্যদিয়ে ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত। কথিত আছে, প্রাচীন কালে হাইলাকান্দি জেলায় দু'টি পৃথক নদী ছিল — ধলেশ্বরী ও বরণা (বর্ণি)। পরবর্তীকালে কাটলিছড়ার নিকটে গাঙ্গাখাউরী গ্রামের নিকট ধলেশ্বরী নদী হঠাৎ ভরাট হয়ে পূর্বদিকে বর্ণির ধারার সাথে মিলিত হয়ে কাটাখাল নামে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। এই কাটাখাল নদীর উৎপত্তি সম্পর্কেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কাছাড় জেলা ইংরেজদের অধীনে আসার পর (১৮৩২ খ্রিঃ) তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার কেপ্টেন ফিসার সাহেব ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী চা-করদের স্বার্থে গাঙ্গাখাউরীর নিকট ধলেশ্বরীতে বাঁধ দিয়ে নালা কেটে বর্ণি নদীর সাথে মিলিয়ে দেন। ঐ কাটানালা (খাল) ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হয়ে যাওয়ায় ধলেশ্বরীর পূর্ণ জলধারা ঐদিকে প্রবাহিত হয় এবং মূল ধলেশ্বরী শীর্ণকায় এক খালে পরিণত হয়। প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও ঐতিহাসিক প্রয়াত রাজমোহন নাথ, আসামের বাঁধ ও সেচ বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার থাকা কালে প্রাচীন নথি পত্র ঘেঁটে একখানা রিপোর্ট পেয়েছিলেন — তাতে কাটাখাল নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি পূর্বতন কাছাড় জেলায় এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ঐ ভূমিকম্পের ফলে গাঙ্গাখাউরীর নিকট ধলেশ্বরী নদীর একাংশ ভরাট হয়ে এক নূতন জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে—এটাই কাটাখাল নামে পরিচিত। ভূমিকম্পে এ ধরনের ঘটনা

Scanned with CamScanner

প্রায়শই ঘটে থাকে — কোনও স্থানে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় বা কোনও কোনও জায়গা জলের নীচে তলিয়ে যায়।

বর্তমান হাইলাকান্দি শহর ৬.৪৪ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। তৎকালীন মহকুমাধিপতি মিঃ হার্টবার্ট সাহেব শহরের উন্নতিকল্পে নানা ধরনের কাজ করে যান। সম্ভবত ১৮৯৩-৯৪ সালে ২০ বিঘা ১ কাঠা ১১ ছটাক ক্ষেত্র নিয়ে বিরাট এক বাজার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাজারটি বর্তমানে হার্টবার্টগঞ্জ বাজার নামেই পরিচিত। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কাছারি রোডে যে বড় বড় গাছগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে ওগুলোও হার্টবার্ট সাহেবেরই অবদান।

হাইলাকান্দি শহরের সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা গড়ে ৩৫.৫° সেলসিয়াস ও ৯.৫° সেলসিয়াস যদিও ইদানীংকালে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। শহরের গড় আর্দ্রতা শতকরা ৬০ ভাগ। সর্বাধিক ৮৫.৫ এবং সর্বনিম্ন ৫২ । বর্তমানে শহরের মধ্য দিয়ে ১৫৪ নং জাতীয় সড়ক উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত। হাইলাকান্দি শহরের লোকসংখ্যা (২০০১ সনের গণনা মতে) ৩০১৭৮ তন্মধ্যে পুরুষ ১৫৬৩৮ এবং মহিলা ১৪৫৪৪ জন। শহরে বর্তমানে পৌর এলাকায় ১৬ টি ওয়ার্ড। শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষ ১২১৩৯ জন এবং মহিলা ১০৬৬০ জন।

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি শহরের গোড়াপত্তন

হাইলাকান্দি জেলা সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রামাণ্য দলিলাদি বর্তমান। তবে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগের কোনও ইতিহাস আমাদের জানা নেই। ইতিহাসবিদরাও এ বিষয়ে নীরব। অসমিয়া বুরুঞ্জী থেকে জানা যায় যে এ অঞ্চলে জয়তুঙ্গবর্ষ বলে একটি রাজ্য ছিল — সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে। হাইলাকান্দি জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে শকওয়ালা দীঘির পাড়ে একখানা ইট পাওয়া গেছে —তাতে "হরিশ্চন্দ্র মহারাজ— ১৪০৯ শকাব্দ" লিপিবদ্ধ আছে— সেসব ইতিহাসের কথা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় হাইলাকান্দি শহরের কোনও উল্লেখ নেই —এখানে কোনও গঞ্জ বা জনপদ প্রাচীন রাজাদের আমলে ছিল কিনা, তারও কোনও উল্লেখ নেই। সরকারি রেকর্ড মতে হাইলাকান্দি মহকুমায় উন্নীত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন। কিন্তু তার আগে হাইলাকান্দি শহর কীভাবে হল বা এখানে কোনও জনপদ বা লোকবসতি ছিল কি না—এ সম্পর্কে কেউ কিছু লিখে যাননি — অন্তত এ ধরনের কোনও লিখিত দলিল পাইনি— হয়তো বা এ অঞ্চলের আদি বসবাসকারি ব্যক্তিগণের কারও কারও বাড়িতে তথ্যাদি বা দলিলাদি থাকতেও পারে। District record room-এ হাইলাকান্দি সম্বন্ধে বিস্তারিত কোনও তথ্য, কাগজপত্র বা দলিলাদি পাওয়া যাচ্ছে না বা থাকলেও তা উদ্ধার করা যাচ্ছে না। শোনা যায় — একবার নাকি এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অনেক সরকারি কাগজপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী খ্রিস্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে আবিষ্কৃত নিধনপুরের তাম্রফলক বা কালাপুরা ভাটেরা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত তাম্রফলকে কিছু কিছু আদি ইতিহাস পাওয়া গেছে। কিন্তু তৎপরবর্তী সামাজিক বিবর্তন — বা ব্রিটিশের আগমন কীভাবে হল — এ সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও মনে করা হচ্ছে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে একদল বিদ্রোহী সেনা —সিলেট হাইলাকান্দি হয়ে মণিপুর যাবার কালেতে হাইলাকান্দির অদূরে মোহনপুর নামক স্থানে ব্রিটিশ সেনাদের সাথে তাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়—যে জায়গাটি 'রণটিলা' নামে খ্যাত। জনশ্রুতি এস্থানে অনেক বিদ্রোহী সেনার ফাঁসি দেওয়া হয়। ঐ অঞ্চলে কিছু কিছু শহিদের সমাধি চিহ্ন রয়েছে। বিদ্রোহী সেনাদের বীরত্বগাথা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেক গীত রচনা করেছেন যা 'জঙ্গিয়ার গীত' নামে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ঐ-যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনের সুবিধার্থে হাইলাকান্দি মহকুমা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয় এবং বর্তমান হাইলাকান্দি শহরকেই মহকুমার সদর করা স্থির করে। ভারতবর্ষের আদিসাহিত্য যেমন বেদ, উপনিষদ বা অশোকের শিলালিপি ইত্যাদিতেও এ অঞ্চলের অবস্থিতির কোনও উল্লেখ নেই। তবে ভাষাবিদ শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ অঞ্চল সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করে গিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন পূর্ববাংলার কথিত ভাষার সঙ্গে এ অঞ্চলের ভাষার সামঞ্জস্য থেকে এটাই ধরে নেওয়া যায় যে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা অস্ট্রিক শাখার কিছু লোক ইন্দো-মঙ্গোলীয়দের সাথে মিশে যায় এবং পরবর্তীকালে আর্যরা এসে তাদের ভাষা ও কৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করেছেন।

হাইলাকান্দি শহরের গোড়াপত্তন নিয়ে চর্চাটাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—জানি না এর আগে কোনও বিদ্বজ্জন বা ঐতিহাসিক কেউ হাইলাকান্দি শহরের গোড়াপত্তন নিয়ে—এর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন কিনা। ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজশক্তি পূর্বতন কাছাড় জেলাকে ১৮৩২ সালে অধিগ্রহণ করে। ব্রিটিশরা প্রথমে কাছাড় জেলায় প্রবেশ করে ১৭৬২ সালে—মণিপুর রাজার সাহায্যার্থে। ১৮৩০ সনে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র মারা যান। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চায়ের চাষ আরম্ভ হয় ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চায়ের গাছ কাছাড়ের জঙ্গলে আবিষ্কৃত হয় এবং ঐ বৎসরের জুলাই মাসে সরকারের

Scanned with CamScanner

নিকট এ আবিষ্কারের কথা জানানো হয়। কাছাড়ের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রয়াত দেবব্রত দত্ত মহাশয় District Record Room ঘেঁটে কিছু কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেছিলেন। বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রকাশিত 'গবেষণা পর্ষদ' এর বইয়ে "কাছাড়ের চা শিল্পের আদিপর্ব" প্রবন্ধে ঐ সব তথ্যাদি নথিপত্র সহকারে তিনি প্রকাশ করেছেন। এ প্রবন্ধে দু'এক জায়গায় হাইলাকন্দি অঞ্চলের চা বাগান-এর পত্তন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্যাদি প্রাচীন নথিপত্রের প্রসঙ্গ এনে— তিনি উদ্ধৃতি সহ তা উল্লেখ করেছেন। এসব তথ্যাদি থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চা-শিল্পকে কেন্দ্র করেই হাইলাকান্দি শহরে জনপদ গড়ে উঠেছে। হাইলাকান্দি অঞ্চলে চা-শিল্প গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে একটি চিঠির তিনি উল্লেখ করেছেন—চিঠিটির কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

তারিখ 10th July, 1855

Mr Stewart, the then Superintendent (Administrative Officer) submitted one plant specimen brought by an individual to Dr. Thomas Garden, Superintendent of 'Government Botanical Garden, Calcutta'. Dr.Thomas in a letter said, '... ... The speciment forwarded by you are beyond any reasonable doubt the true tea plant (Assam variety),...

অর্থাৎ এ চিঠি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে এ অঞ্চলে চা গাছের অস্তিত্ব অনেক আগেই ছিল। এ ঘটনার পরই হাইলাকান্দি অঞ্চলে চা বাগান করার হিড়িক পড়ে যায় এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার থেকে জমি বন্দোবস্ত নেওয়া আরম্ভ হয়। সরকারি জমির বন্দোবস্ত অর্থাৎ Land Allotment সংক্রান্ত একটি দলিল নিম্নরূপ —

M. Hering, Silchar for 5 to 700 acres in Serispore Pargana (253) 25th Nov, 1855 এই Land allotment এর চিঠিতেই বর্তমান হাইলাকান্দি শহর থেকে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত সরসপুরের (সরকারি Serispore) উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও আরেকটি সরকারি দলিলে এ অঞ্চলের জায়গার উল্লেখ আছে ——

I have ascertained that tea plants is growing —at Barrahangun near Hyleaka-ndy. যদিও হাইলাকান্দি বানান-টা একটু অন্য ধরনের তথাপি

Scanned with CamScanner

এটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটা আমাদের বর্তমান হাইলাকান্দিই হবে। Land Allotment এবং উল্লিখিত চিঠিগুলো লিখেছেন Mr. G. Verner, Administrative Officer, British Government.

In letter dated 30th August, 1856, addressed to the Tea planters of Cachar এটা লক্ষ করা যায় যে By 1860 plantation had vastly increased and we then met W. H. Mc Arthun of Seerespur, James Abernutty of Manacharra H.C. Gibson of Mohunpur etc. – – by R. Stewart officiating. Superintendent. এতসব তথ্যাদি থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে চা শিল্পের পত্তনের পর থেকেই হাইলাকান্দি অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয় এবং লোকালয় গড়ে উঠে।

হাইলাকান্দিতে রেল লাইন বসে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—(সম্ভবত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে)। শোনা যায় চা-বাগানের ইউরোপিয়ান কর্মচারীরা রেল লাইন বসার আগে ঘোড়ায় চেপে সালচাপরা রেল স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে চড়তেন। পথিমধ্যে—চিপিটাভিজিয়া নামক গ্রামে Inspection Bunglow তে বিশ্রাম নিতেন। বাংলোটি বর্তমানে নেই। পথ পরিক্রমায় শ্রান্ত ইউরোপিয়ান কর্মচারীদের বিশ্রামের জন্যই বাংলোটি তৈরি করা হয়েছিল। অতীতের এসব নিদর্শনের থেকেই হাইলাকান্দি শহরের পত্তন কীভাবে হল—বা জনবসতিই বা কোথা থেকে এল, তার কিছুটা আভাস নিতে পারি।

হাইলাকান্দি শহর এলাকা চারিদিকে চা-বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত—উত্তরে চণ্ডিপুর, বর্ণিব্রীজ বাগান, দক্ষিণে মনাছড়া বাগান (যা বর্তমানে প্রায় নেই), আয়নারখাল বাগান পূর্বে বন্দুকমারা চা-বাগান ও পশ্চিমে সরসপুর চা-বাগান। উল্লিখিত সবগুলি বাগানই শহরের ৫-৭ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। যেহেতু চা বাগানের জন্য টিলাভূমির প্রয়োজন — যেখানে জল জমা থাকে না — সে কারণেই বোধ করি শহরের সমতল অঞ্চলে জল জমার আশঙ্কায়—বা ধলেশ্বরী—কাটাখাল দু'টি নদী মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত চা গাছের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনায় মধ্যের সমতল জায়গা বাদ দিয়ে আশেপশের টিলাভূমিতে চায়ের চাষ আরম্ভ হয় এবং শহরের তুলনামূলক ভাবে উচ্চভূমিতে সরকারি কার্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা হয় বলে ধারণা করা যেতে পারে। এবং এইসব চা-বাগানের কাজকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য

Scanned with CamScanner

সরকারি রাজস্ব উপলক্ষ্য করেই বাইরে থেকে কিছু লোক শহরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই চা-ব্যবসা উপলক্ষ্য করেই অনেক লোক সিলেট থেকে এসে হাইলাকান্দিতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি জায়গা থেকেও একদল ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এখানে আসেন। এভাবেই ধীরে ধীরে নানা ভাষা, নানা ধর্মের লোকের—একটা জনবসতি গড়ে উঠে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব আদায়ের জন্য ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু অফিস কাছারি স্থাপন করে। তারপর ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এ অঞ্চলে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং হাইলাকান্দি নামে একটি ছোট শহরের পত্তন হয়। তৎসহ পূর্বোল্লিখিত সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনার ফলেও তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার হাইলাকান্দি অঞ্চলে সরকারি কিছু কিছু অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐসব অফিস কাছারি উপলক্ষ্য করেও একটা জনগোষ্ঠী এখানে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই হাইলাকান্দি শহরের পত্তন হয় বলে জনসাধারণের বিশ্বাস।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ফিসার এর চিঠিতে হাইলাকান্দির এক মিরাসদার এর সঙ্গে জমির খাজনা বাবদ চুক্তি করেন জানা যায়। অর্থাৎ তখনও এ অঞ্চলে লোক বসতি ছিল বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলের জমির খাজনা সম্পর্কে Caplam F. Jenkim, Commission of revenue কে লিখা চিঠিতে Collector T. Fisher খাজনা কমানোর ব্যাপারে Hylakandee নামক জায়গার উল্লেখ আছে (কোনও কোনও চিঠিতে Hylacondy-ও লেখা আছে)।

হাইলাকান্দি শহরে ধীরে ধীরে ব্যবসা উপলক্ষে নানা স্থান থেকে লোক জড়ো হতে লাগল। দীননাথ বিশ্বাস বলে এক ভদ্রলোক— সম্ভবত সিলেট অঞ্চল থেকে এসে হাইলাকান্দি কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। এছাড়া শহরে অদূরে নিতাইনগরের ইরপান আলি লস্কর-রাও কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং বনাঞ্চলে এদের হাতিও ছিল। বর্তমান সারদা স্টোর্সের উত্তর দিকটায় বাজার বসত, নাম ছিল বরইবাড়ি বাজার। পরবর্তীকালে মহকুমাধিপতি হার্টবার্ট সাহেবের আমলে ধলেশ্বরী নদীর অপর পাড়ে বাজারটি স্থানান্তরিত হয়ে নাম হয় হার্টবার্টগঞ্জ বাজার। বাজার এলাকায় বারুজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা পানের

Scanned with CamScanner

ব্যবসা করত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উমেশ দে, মথুর দে প্রমুখ (এদের বংশধররা এখনও বাজার এলাকায় আছেন)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হাইলাকান্দিরই সন্তান কামিনী নাথ যিনি পূর্বতন কাছাড় জেলার Settlement Officer ছিলেন শোনা যায় তিনিই নাকি মাছিমপুর জায়গাটিকে নামকরণ করেন অরুণাচল। হাইলাকান্দি শহরের দক্ষিণ ভাগে অনেক জমি জায়গার মালিক ছিলেন সুরেশ চক্রবর্তী। হাইলাকান্দি শহরের গরুর গাড়িই ছিল একমাত্র যানবাহন। শহরের একেবারে দক্ষিণ দিকে ললিত দারোগার বাড়ি — যা মুখে মুখে দারোগা বাড়ি বলেই পরিচিত—তারাই নাকি প্রথম একটা পিতলের বডি বাস গাড়ি তৈরি করেন এবং লোকের যাতায়াতের যানবাহন হিসেবে তা ব্যবহার করেন।

Scanned with CamScanner

শহরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

কথায় আছে পাঁচজন বাঙালি একত্রিত হলে কালীবাড়ি গড়ে তোলেন — হাইলাকান্দিতেও তার অন্যথা হয়নি — বারোজন ইয়ার বা বন্ধু একত্রিত হয়ে বারোয়ারি দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছিল — হাইলাকান্দি শহরে তাও হয়েছে। হাইলাকান্দি শহরের সীমানা কতটুকুই বা ছিল — উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশন, পশ্চিমে কালীবাড়ি, দক্ষিণে শিববাড়ি ছাড়িয়ে অল্পদূর পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ সিনেমা হল আর পূর্বে রেল লাইন—এনিয়েই ছিল শহর হাইলাকান্দি—লোক সংখ্যাও ছিল সীমিত। হাইলাকান্দিতে দুর্গাপুজো কবে আরম্ভ হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তার উনিশ শতকের প্রথমভাগে শহর সংলগ্ন রাঙাউটি গ্রামের পুরকায়স্থ বাড়ির পুজোই জেলার প্রাচীনতম পুজো বলেই অনুমান করা হয়। এ ছাড়া শহরের নিকটবর্তী (বর্তমান আট নম্বর ওয়ার্ড) গাঙপার ধূমকার এর রায়সাহেব চক্রবর্তী বাড়ির পুজো। বোয়ালিপারের চৌধুরী বাড়ির পুজো, ভাটিরকুপার মজুমদারদের বাড়ির পুজো — এগুলিই ছিল এ এলাকায় দুর্গাপুজো। মনে আছে রায়সাহেব চক্রবর্তীদের বাড়ির পুজোর নবমীর দিন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার নেমন্তন্ন থাকত শহরবাসীর। সেই রামও নেই—সেই অযোধ্যাও নেই। আজ রাঙাউটির পুরকায়স্থ বাড়ির পুজো ছাড়া আর সব বাড়ির পুজোই বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি ছাড়া শহর এলাকায় দু'একটি বাড়িতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে প্রয়াগকৃষ্ণ দত্তগুপ্তের বাড়ির দুর্গাপুজো অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এছাড়া শিববাড়ির লাগোয়া গলিতে

Scanned with CamScanner

সুরেন্দ্র দেব—শশী দেব ও যতীন্দ্র দেবের বাড়িতেও দুর্গাপুজো পাঁঠাবলি সহকারে অনুষ্ঠিত হত।

দেশভাগের আগে হাইলাকান্দি শহরে পুজোতে ঢাকের আওয়াজ শোনা যেত না—আমরা ছোটবেলায় ঢাকের চেহারাই দেখিনি—বোধ হয় এ অঞ্চলে ঢাকি ছিল না। দেশ ভাগের পর পুর্ববঙ্গ থেকে কিছু কিছু ঢাকি এ অঞ্চলে আসার পর থেকেই দুর্গাপূজায় ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশের দশকে প্রথম বারোয়ারি পুজো অনুষ্ঠিত হয় বলে শোনা যায়। শহরে বারোয়ারি পূজো একটাই ছিল—এবং তা হতো প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ে বাড়ির সম্মুখ প্রাঙ্গণে—যার পশেই ছিল হাইলাকান্দি শহরের প্রথম ব্যাংক — ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংক। যদিও তৎকালীন ঘরবাড়ির কিছুরই অবশিষ্ট নেই। ঐ বারোয়ারি পুজোতে ঢাকি ছিল না — ছিল বিভিন্ন ধরনের কাঁসর ঘণ্টা। মনে আছে ফুটবলের গোল পোস্টের মত বাঁশ বেঁধে তাতে বিভিন্ন ধরনের কাঁসর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হত—সবাই মিলে ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে চারদিক মুখরিত করে তুলত। সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর আরম্ভ হত নাটক—স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নাটক। মণ্ডপের উল্টোদিকে নাটকে স্টেজ বাঁধা হত। সামনে মাটিতে শতরঞ্চি বিছিয়ে সবার বসার ব্যবস্থা ছিল। পুজোর পর বসত যাত্রাগানের আসর। কলকাতা ও পূর্ববাংলার থেকে নট্য কোম্পানি ঘাটিয়া, ভুটিয়া ইত্যাদি নাট্যদল আসত। প্রমোদরঞ্জন সেনের বাড়ির মাঠেই বসত যাত্রার আসর। মাঝখানে স্টেজ ও তার চারপাশে মাটিতে ত্রিপল বা শতরঞ্চিতে পুরুষরা বসত। মেয়েদের বসার ব্যবস্থা ছিল, অশ্বিনী সেনের চৌচাল শনের ঘরের চিক দিয়ে ঢাকা বারান্দায়। পরবর্তীকালে শিববাড়িতেই দুর্গাপুজো আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যুব সমিতির পুজো আরম্ভ হয়। রামনারায়ণ ট্যাংকের পাশে একবার বড় পুজো হয়। মুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল মহরম। মহরমের দিন তাজিয়া নিয়ে একদল ধর্মপ্রাণ মুসলিম শহরের খেলার মাঠে এসে জড়ো হত এবং লাঠি ও তরোয়াল খেলা (Mock fight) প্রদর্শন করত। এ উপলক্ষ্যে মাঠের আশেপাশে দোকানপাট বসে প্রায় ছোট খাটো মেলা বসে যেত। যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। মেলায় হিন্দু মুসলিম সবারই অবাধ গতি ছিল। সবাই তা উপভোগ করত। এটি একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবেই চলে আসছে।

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি শহরের সংস্কৃতিচর্চা

শহরের সীমিত এলাকায়, গোটাকয়েক ঘরবাড়ি, সীমিত সংখ্যক জনগোষ্ঠী, কয়েকখানা স্কুল (কলেজ ছিল না) ও গ্রামীণ পরিপার্শ্বিকতায় বেড়ে উঠেছে এই শহর। কিছু কিছু সংস্কৃতিবান জনগোষ্ঠীর আগমনে শুরু হয়েছে সংস্কৃতিচর্চা। বাঙালিদের রক্তে বয়ে চলেছে সংস্কৃতির ধারা—তারই প্রকাশ এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিচর্চা। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে লোকসংস্কৃতি—যেমন ভাটিয়ালি গান, কবিগান, পদ্মপুরাণ, হাট বাজারে পথপার্শ্বে স্বরচিত লোকসংগীত—কিছু কিছু স্থানীয় ভাষায় —শহরের সংস্কৃতি বলতে যাত্রা থিয়েটার, কিছু কিছু বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত, লোকগীতি ও কীর্তন—এ নিয়েই শহরের সংস্কৃতিচর্চা। এছাড়াও বিবাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ করে গ্রামদেশে কিছু কিছু গীত গাওয়া হত— মাঘ মাসের প্রতি রবিবারে অনেকের বড়িতেই সূর্যগীত ও গ্রামাঞ্চলে বারোমাসী গানেরও প্রচলন ছিল।

হাইলাকান্দি শহরে নাট্যচর্চা শুরু হয় মুখ্যত দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে। আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে যেখানে বারোয়ারি দুর্গাপুজো হত তারই মাঠে পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিরাত্রে থাকত নাটক, ঐতিহাসিক নাটকই প্রাধান্য পেত। এর আগেও দু'একখানা নাটক পরিবেশিত হয়েছে বলে শোনা যায়। তৎকালে বিভিন্ন সময়ে যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে

Scanned with CamScanner

— সেইসব নাটকে শিল্পীরা ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, যতীন্দ্র মোহন ধর, ধরণীধর চৌধুরী, শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য, আশু ধর, গিরিশ ঘোষ, ললিত শর্মা, কালীদাস ঘোষ, লোকেন্দ্র চক্রবর্তী, কামাখ্যা দাশগুপ্ত, কিরণ পুরকায়স্থ, ক্ষিতীশ পুরকায়স্থ। মনে আছে নাটকের আরম্ভ হত রাধাকৃষ্ণের যুগল নৃত্য দিয়ে। কামিনী নাথের দুই মেয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করত। এছাড়া লালা বাজারের লালবিহারী নাথের নৃত্য আমরা দেখেছি। নাটকে অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা হলেন—শ্রীধর বিশ্বাস, মতি দত্তগুপ্ত, পরবর্তীকালে সন্তোষ কুমার রায়, মাখন চক্রবর্তী, রনেন দত্ত, বীরেন দত্ত, সতীশ দে, দাশু সেন, কানু ধর, ব্রজেশ দত্ত, রামচন্দ্র কানু, যতীন্দ্র দেব প্রমুখ। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে অনেক অপেশাদার নাটুকেরা থিয়েটার ছাড়াও যাত্রানুষ্ঠান করেছেন। রামনারায়ণ ট্যাংকের পাশে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকের সিন সিনারি এঁকেছেন হাইলাকান্দি শহরে বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী মণীন্দ্র ভট্টাচার্য। Dramatic Club ও New Friends Club নামক দুটি নাট্যসংস্থা বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকগুলোর মধ্যে 'পৃথ্বীরাজ', চাঁদ সদাগর, টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথ্বীরাজ নাটকের নাম ভূমিকায় বর্তমান লেখকের পিতা যতীন্দ্র মোহন ধর সুঅভিনয় করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে। এছাড়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো অভিনয় করেছিলেন সিরাজের ভূমিকায় ঁকামাখ্যা দাশগুপ্ত এবং জলদস্যু পেড্রোর ভূমিকায় সন্তোষ কুমার রায়। মহিলা চরিত্রে সতীশ দে ও তেজেশ (চন্দ্রা) মজুমদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন আগে শিলচরের আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংস্থা টাউন হলে 'সৈনিকের স্বপ্ন' নাটকখানি সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

হাইলাকান্দি শহরের পরিসর ও লোকসংখ্যা কম থাকায় সংস্কৃতিচর্চা ঠিক ততটুকু হয়নি, তবুও গাঙপার ধূমকরের রায়সাহেব চক্রবর্তীদের বাড়িতে কিছু গান বাজনা সংস্কৃতি চর্চা হত। শহরের সংস্কৃতি শিল্পী বলতে ফণীভূষণ রায় সেতার বাজিয়ে হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি HMV তে তাঁর সেতার বাজনা রেকর্ডও করেছিলেন। কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে মদন মোহন ধর ও ময়না দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত সানাই বাদক পীর আলি নাকি হাইলাকান্দিতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি শহরের খেলাধুলা

প্রাককথন ঃ

হাইলাকান্দি শহরের পত্তনের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন হাইলাকান্দি মহকুমা রূপে ঘোষিত হয়। ১৯২৪ সালে টাউন কমিটি গঠিত হয়। তারও আগে ১৯১০-১১ সালে ছিল টাউন ইউনিয়ন তাই সরকারি ইতিহাসে নথিভুক্ত করা আছে। কিন্তু খেলাধুলার ইতিহাস বোধ হয় কোথাও লেখা নেই বা লিখিত হয়নি — কি সরকারি কি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। বিগত শতাব্দীর—কেউই বেঁচে নেই—যিনি হাইলাকান্দি শহরের খেলাধুলা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারতেন। বেশ ক'বছর আগে বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিনের কিছু তথ্যাদি পেয়েছি স্থানীয় বৃদ্ধদের মুখ থেকে—কিছু ইতিহাস জানা গিয়েছিল, তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই ও অন্যান্য চিঠি পত্রাদি থেকে সে সর মনে রেখে বিগতদিনের কিছু ইতিহাস পরিবেশিত হল। বিগত শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে হাইলাকান্দি শহরে প্রথাগত ফুটবল খেলার প্রচলন হয় বলে জানা যায়। তারও আগে কিছু কিছু লৌকিক ক্রীড়া—যেমন গোল্লাছুট, ধাইরাবান্দা (নুন্দাই), কাবাডি, ডাংগুলি—এ ধরনের কিছু কিছু গ্রামীণ ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। এছাড়া ইনডোর গেমসের—যেমন দাবা, পাশা, যোলগুটি ইত্যাদি খেলার প্রচলন

Scanned with CamScanner

ছিল। কোন খেলা কোথায় কিভাবে সুরু হয়েছিল তা বলা মুস্কিল। How does a game travel from one country to another? Does every game have a strating place? কালের স্রোতে খেলাধুলারও প্রথাগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ফুলগুটি খেলা বা গোল্লাছুট বা একপায়ে ঘুরে ঘুরে এক্কাদোক্কা খেলা।

গোড়ার কথা ঃ

হাইলাকান্দি শহরের প্রথাগত ফুটবল খেলা আরম্ভ হয় বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে সম্ভবত ১৯০৫ সালে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে এবং ঘটনাটির বাস্তবতা আছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে হাইলাকান্দি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপিত হয় (পরবর্তীকালে সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ১৯০৫ সনে তদানীন্তন মহকুমাধিপতি মিঃ ডানস্টোন সাহেব একদিন বিনা নোটিশে স্কুলে গিয়ে হাজির। প্রধান শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রেরা সবাই অস্থির কী হয় কী হয় ভাব। কারণ এসময়েই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল—বিশেষ করে বাঙালি অধ্যুষিত বাংলা ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী। বাংলা তখন অগ্নিগর্ভ —সারা পূর্বভারত চাপা রোষে উত্তাল। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে মিঃ ডানস্টোন সাহেব প্রধান শিক্ষক রাজকুমার সেনকে ডেকে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রচলন করার কথা বললেন। ব্যাস্— সেই থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল হাইলাকান্দিতে ফুটবল খেলা। রাজকুমার সেন, জগদীশ দত্ত প্রমুখ শিক্ষকদের উৎসাহে স্কুলের সামনে মাঠে হয়ে গেল ছাত্রদের ফুটবলের হাতেখড়ি। হাইলাকান্দি শহরের আশে পাশে চা-বাগানগুলোতে কর্মরত ইংরেজরাও খেলাধুলায় উৎসাহ জোগাল—এমনকি নিজেরাও স্থানীয় খেলায় অংশগ্রহণও করে উৎসাহ বাড়িয়েছিল।

বরাক উপত্যকায় ১৮৯০ সালে প্রথম ফুটবল খেলা আরম্ভ হয় বলে জানা যায়। ১৯০০ সালে শিলচরের বিখ্যাত ইণ্ডিয়া ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম গঞ্জে ফুটবল খেলার প্রসার নিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একটা চোরাস্রোত প্রবাহিত

Scanned with CamScanner

হয়েছিল—জনসাধারণের মধ্যে। ব্যাপারটা হল ইংরেজরা নাকি ভারতীয় যুব সমাজকে স্বাধীনতার বিপ্লবী চিন্তা ধারাকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই ফুটবল খেলাকে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল। কিছুকাল পরই ১৯১৩ সনে অবনী কুমার দত্তগুপ্তের প্রচেষ্টায় "হাইলাকান্দি ফুটবল ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রথম গঠিত হয়। বড়দিনের উৎসবে আশেপাশের বাগানগুলির ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মচারীরা স্থানীয় ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। প্রায় সেই সময়কালেই চা-বাগানগুলোর ইউরোপীয় কর্মচারীরা "মনাছড়া ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাবটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। প্রতি সপ্তাহে একদিন এলাকার সাহেব কর্মচারী সমবেত হয়ে আনন্দ ফুর্তি করতেন—খেলাধুলা করতেন। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় যুবকরাও খেলাধুলার দিকে উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদি নানা ধরনের খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সেই সময়কালে যাঁরা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন বা খেলতেন তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হল—এরা হলেন অবনী দত্তগুপ্ত, সুরেন্দ্র ধর, দিগিন্দ্র ঘোষ, হবিব আলী, সতীশ কর, অশ্বিনী ধর, তারাকিশোর বাবু প্রমুখ আরও অনেক ব্যক্তি বর্গ—যাঁদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে লালাবাজার সহ অন্যান্য এলাকায়ও খেলাধুলার প্রসার লাভ করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে হাইলাকান্দি শহরের কিছু উদীয়মান যুবক "হাইলাকান্দি স্পোর্টিং ক্লাব" নামে একটি ক্লাব গঠন করেন। প্রায় সেই সময়েই শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম রায়সাহেব চক্রবর্তী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় "ধূমকর ফুটবল ক্লাব' গড়ে উঠে। ঐদলে অনেকের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন — নবগোপাল মোহন্ত, ইন্দ্রেশ্বর মোহন্ত, অশ্বিনী ধর, বিমল দে, হবিব আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ঐসময় প্রায় প্রতি বৎসর চক্রবর্তী বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় হাইলাকান্দি ও শিলচর দলের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। শিলচরের প্রখ্যাত খেলোয়াড় নলিনী মোহন গুপ্ত যিনি 'ক্যাপ্টেন গুপ্ত' নামেই সর্বাধিক পরিচিত—তিনিও এখানে এসে খেলতেন। ১৯২৭ সালে হাইলাকান্দি স্কুল দল প্রথমবারের মতো সিলেট শহরে অনুষ্ঠিত "সুরমা উপত্যকা আন্তঃস্কুল টুর্নামেন্টে" যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে সন্তোষ কুমার রায়-এর প্রচেষ্টায় "ইয়ংম্যান এথলেটিক ক্লাব" (Y.M.A.C) গঠিত হয়। ১৯৪১-৪২ সালে ক্লাবটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত "বাসন্তী স্মৃতি শীল্ড" ফটবল

Scanned with CamScanner

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সে বছর এ প্রতিযোগিতায় কলকাতার বিখ্যাত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও কালীঘাট ক্লাব অংশ গ্রহণ করেছিল। এ দলে যাঁরা খেলোয়াড় ছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্র মোহন ধর, ধরনীধর চৌধুরী, সতু দেব, মতি দত্তগুপ্ত, ফণীশ দত্তগুপ্ত, ব্রজেশ দত্তগুপ্ত, রবি দত্তগুপ্ত, অনিমেষ দত্ত, মেঘা চৌধুরী, সন্তোষ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালে শহরের কিছু মুসলিম যুবক মিলে Muslim Sporting নামে একটি ক্লাব গঠন করেন। ১৯৪৪ সালে শহরের Town Club নামে আরেকটি ক্লাবের প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৫ সন Y.M.A.C. দলটি বিহারের বেতিয়ায় (চম্পারন জেলা) মহারাজ গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এছাড়াও দলটি, আগরতলা, ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় — ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় উৎপল রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ছিলেন। তিনি স্বল্প দূরত্ব দৌড়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও Badminton-ও খুব ভালো খেলতেন। স্বাধীনতার সময়কালে নব্য যুবক যাঁরা খেলার মাঠে বিচরণ করতেন তাদের মধ্যে সবার নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি — যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদেরকেই এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন হীরেন্দ্র পাল, দলিন্দ্র নাথ, রেজাক লস্কর, নিজাম চৌধুরী, আব্দুল হক, মিন্টু বিশ্বাস, সুনীল দেব, সুধীর দেব, মুজম্মিল লস্কর, তফঃজ্জুল আলী, অজয় ধর, মুকুল, টুনু মিঞা প্রমুখ।

Scanned with CamScanner

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ অন্যতম পথিকৃৎ। সমাজের উন্নতি কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়—স্ত্রীজাতির উপরও নির্ভরশীল — woman's cause is man's life -- they rise and fall together. মহাপুরুষেরা তাই বলে গেছেন। অতীতে পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীশিক্ষাকে অনেকেই আপত্তিকর মনে করেছিলেন কিন্তু ইতিহাসের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে—অনেক পুরুষই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুলাই কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয় এবং ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে কাছাড়ের রাজ্য শাসন ইংরেজদের হাতে চলে যায়। প্রায় এ সময়টাতেই আমাদের এ-অঞ্চল আসাম রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে ১৮৭৪ খিস্টাব্দে বৃটিশ ভারতের মানচিত্রে আসামের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি আসাম প্রদেশের জন্ম হয়। ইংরেজ শাসনে এ-অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য পূর্বতন কাছাড় জেলার ভারপ্রাপ্ত তদনীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপ্টেন ফিসার, বড়লাট লর্ড বেন্টিংয়ের নিকট রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তিনি স্কুলের জন্য তিন থানায়— শিলচর (সদর), হাইলাকান্দি এবং কটিগড়া ও সোনাপুর পরগণায় স্কুল স্থাপনের

Scanned with CamScanner

প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনসাধারণের অনুদানের উপর নির্ভর করেই শিলচর, হাইলাকান্দি ও কাঠিগড়ায় তিনটি স্কুল চালু হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই আগস্ট পূর্বতন কাছাড় জিলা ব্রিটিশের অধীনে চলে যায়। ১৯০৩ সালের আগে সারা হাইলাকান্দি মহকুমায় সরকার পরিচালিত একটি মাত্র মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল। ১৮৫৪ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে সরকার নিজস্ব কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন না। কিন্তু জনসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলে সরকার সাহায্য করবে। সেই নির্দেশের ফলে হাইলাকান্দির কিছু গণ্যমান্য লোক হাইলাকান্দি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এলেন। যদিও এর আগে স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল বা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে সেই স্কুল স্থায়ী হয়নি। তবে টোল বা মক্তব দু'একটি ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তী কালে অবশ্য জনসাধারণের সাহায্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন বলে সবাই মনস্থির করলেন। ১৮৫৭ সালে স্থানীয় কিছু কিছু লোকের অনুদানের উপর নির্ভর করে হাইলাকান্দিতে একটি স্কুল চালু হয়। সম্ভবত স্কুলটি মধ্য-ইংরাজি স্কুলই ছিল। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনসাধারণ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করেন। সরকার সাদরে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মধ্য ইংরাজি স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে মোট ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত হয় এবং প্রস্তাবিত হাইস্কুলটির নাম হয় Town High School. সম্ভবত ১৯১১/১২ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনসাধারণ রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে "রাণী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হাইস্কুল" রাখেন। ME পর্যায়ে স্কুলটি সরকার পরিচালিত ছিল বলে জানা যায় — কিন্তু স্কুলটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঐ স্কুলের জমি, গৃহাদি ও অন্যান্য সরঞ্জাম নূতনভাবে গঠিত স্কুল কমিটিকে হস্তান্তরণ করে দেওয়া হয় এবং মাসিক সাহায্য হিসেবে সরকার ১৫০.০০ টাকা বরাদ্দ করেন। ১৯১১ সালে ঐ স্কুল থেকে ছাত্ররা প্রথম Matriculation Examination এ অবতীর্ণ হন। ১৯১৩ সালে স্থানীয় প্রশাসন Trust fund তৈরি করার অনুমতি দান করে — 'Hailakandi Victoria Memorial High English School Trust Fund'— — সরকার ৭০০০.০০ (সাত হাজার) টাকার Promisory Note এবং নগদ ১২০০.০০ (বারশ' টাকা) দিয়ে ঐ Fund টিকে সাহায্য করেন। ১৯২০ সালে

Scanned with CamScanner

তদানীন্তন Director of Public Instruction, Assam Mr. J.R Cunningham স্কুলটিকে প্রাদেশীকরণ করার সুপারিশ করেন। (Letter Dated 21st Sept. 1927) সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯২৮ সালে স্কুলটি প্রাদেশীকরণ করা হয়। প্রায় ১৪ বিঘা জমির উপর স্কুল ঘরটি — একটি লাইব্রেরি, অন্যান্য ঘর সহ ১৪ টি ক্লাসরুম দুটি হস্টেল ছিল। প্রাদেশীকরণের পর স্কুলটির হেডমাস্টার রাজকুমার সেন অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রাদেশীকৃত স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার হয়ে শিলচর সরকারি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ আচার্য যোগদান করেন। স্বাধীনতা লাভের প্রাকমুহূর্তে হেডমাস্টার ছিলেন কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে দ'একটা ME School এবং কয়েকটি L.P. School প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মোট স্কুলের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ছেলেদের স্কুল — ১টি (সরকারি ভি এম উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়)

মেয়েদের স্কুল — ১ টি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়,
১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, পরবর্তীতে ইন্দ্রকুমারী)

মধ্যবঙ্গ স্কুল — ১ টি (গ্রেহাম)

প্রাথমিক স্কুল — ২টি (গ্রেহাম ও টাউন বালিকা)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালে ১৯৪৪-৪৫এ আমরা গ্রেহাম স্কুলে প্রাথমিক স্তরে পড়তাম। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতেই Air Raid Protection Force এর বাহিনী এসে আমাদের স্কুল দখল করে নেয়। ফলে আমাদের স্কুল অস্থায়ী ভাবে হার্টবার্টগঞ্জ বাজারে যে লম্বা ঘর ছিল (বর্তমানে অনেকগুলোই নেই), পূর্বদিকের দুটি ঘরে বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুলগৃহ বানানো হয়েছিল। সেই সময়কালে আমরা টিফিনের ছুটিতে বাজারের ভেতর দিয়ে বর্তমান ৫নং ওয়ার্ডের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে কাঞ্চনপুরের রাস্তা অতিক্রম করে মিলিটারি ছাউনি (যে জায়গাটির নাম হয়ে গিয়েছিল কোম্পানিগঞ্জ) দেখতে চলে যেতাম। সেখানে ছোট ছোট যুদ্ধের প্লেন নামত —তা দেখতে আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। মাঝে মধ্যে সাদা চামড়া বা কালো চামড়ার নিগ্রো সৈন্যরা ভেংচি কাটত— আমরা ভয়ে পালিয়ে আসতাম। তবুও আমরা বার বারই তা দেখতে চলে যেতাম।

মোটামুটি ভাবে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে এ অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয় বলে জানা যায়। প্রথমে একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে শহরের শিক্ষাবিদ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১১-০৪-১৯৪৪ইং তারিখে

তাদানীন্তন মহকুমাধিপতি শ্রীযুক্ত অঘোর ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয় —

১) M.E. স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা ও

২) প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ ইংরাজি ক্লাস পর্যন্ত স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালন সমিতির উপর ন্যস্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

পরবর্তী সভায় (১৬-০৫-১৯৪৪ইং) নবম শ্রেণী আরম্ভের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৫-০৬-৪৪ইং তারিখের সভায় বাবু রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে প্রধান শিক্ষক ও শ্রীযুক্ত স্নেহলতা দাশগুপ্তকে সহ-প্রধান শিক্ষিকা পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তাঁরা অসম্মতি জানালে বাবু যতীন্দ্র মোহন নাগ মহাশয়কে প্রধান শিক্ষক এবং শ্রীযুক্ত সুশীল দাসকে সহ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৪৫ সনে টাউন কমিটি এল পি ও এম ই স্কুলটিকে Town Govt. High School এর কমিটিকে হস্তান্তরিত করে। তদানীন্তন শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে প্রয়াত ডাক্তার যোগেন্দ্র কিশোর সেনগুপ্তের সহধর্মিণী প্রয়াতা নীরজাবালা সেনগুপ্তার কঠোর পরিশ্রম ও দুর্গাসুন্দরী দত্তগুপ্ত, হেমলতা দাসগুপ্তা (যিনি ছাত্রীদের নিকট খুকুমাসী বলেই পরিচিত ছিলেন) ও অন্যান্যদের নিরলস চেষ্টায় স্কুলটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রী তৈরি করেন। ১৯৪৬ সালে ৬ (ছয়) জন ছাত্রী প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন। ১৯৪৯ সনে প্রাথমিক স্কুল স্তর হাইস্কুল থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতা আন্দোলনে হাইলাকান্দি

দেশের অন্যান্য অংশের মত হাইলাকান্দিতেও স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু নজির আছে। বর্তমান লেখকের ঠাকুর্দা প্রয়াত বনমালী ধর ছিলেন মোক্তার। তাঁর অন্নে বহু লোক লালিত পালিত হয়েছেন,— হাইলাকান্দি শহরের কাছারী রোডের বাড়িতে। ব্রাহ্মমুহূর্তে সকলকে ডেকে পড়াতে বসাতেন। নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতদঞ্চলে প্রসার প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন বনমালী ধর ও তাঁরই কন্যা হেমলাত দাসগুপ্ত — যিনি 'খুকু'মাসী বলেই অধিক পরিচিত । সম্ভবত ১৯৩০ সালে সন্তদাস বাবাজী মহারাজ সশিষ্য ঠাকর্দা বনমালী ধরের বহির্বাটিতে প্রথম হাইলাকান্দিতে এসে অবস্থান করেছিলেন। সন্ধে বেলায় শহরের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীরা সন্তদাস বাবাজী মহারাজের ধর্মালোচনা শুনতে জড়ো হতেন—তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত উকিল গঙ্গাচরণ বিশ্বাসও উপস্থিত থাকতেন। আলোচনা এতই গভীর হত যে গঙ্গাচরণবাবু অনেক সময়ে ভুলেই যেতেন যে সন্তদাসজী মহারাজও ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল—তাঁর সংসারিক নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টেরই লোক—বামইয়ের চৌধুরী বাড়ির। ঐসব আলোচনা কালে বরিষ্ঠ উকিল কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, হরসুন্দর চক্রবর্তী, লেখকের পিতা যতীন্দ্র মোহন ধর প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকতেন এবং ধর্মালোচনায় অংশ নিতেন — বিশেষ করে নিম্বার্ক সম্প্রদায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা হত। ঐসব

Scanned with CamScanner

আলোচনার প্রভাবেই গঙ্গাচরণ বিশ্বাস ও আরও অনেকেই নিম্বার্ক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সন্তদাস বাবাজীর প্রধান শিষ্য ধনঞ্জয় দাস মহারাজ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বনমালী ধর মহাশয়ের বাড়ি থেকেই নিম্বার্ক মতবাদের যাত্রা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে হরসুন্দর চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিলরা শিষ্যত্ব গহণ করেন।

তারও আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভাব কিছু কিছু লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থকে। স্বদেশি গন্ধ পেলেই ব্রিটিশ রাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যেত। এরই মধ্যে বনমালী ধরের এক নাতি, কৃষ্ণকায় এক যুবক, মাথায় গান্ধীটুপি, গায়ে ফতুয়া পরনে খাটো ধুতি — কুমিল্লা থেকে পালিয়ে এসে হাইলাকান্দিতে আত্মগোপন করেন এবং এলাকায় স্বদেশি আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত করেন। — হাইলাকান্দিতে স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এই ধর বাড়ি থেকেই। ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষেই স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের বাড়ির নিকটেই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী সদয়গোবিন্দ দাসের বাড়ি — সেখানে দিবারাত্র কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীয়মান থাকত। ১৯৩০ সাল নাগদ বর্তমান বাটার দোকানের সামনেই সদয়গোবিন্দ দাস প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কাছারী রোডে (বর্তমান একাদশ শহিদ সরণি) আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরই কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মকর্তা লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল নগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি। তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়নাথ চৌধুরী তৎকালে স্কুলে পাঠরত সময়ে স্কুলে মুসলিম লীগের মন্ত্রীর স্কুল পরিদর্শন কালে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে তিনি শাস্তি পেয়েছিলেন। বর্তমান রামনারায়ণ ট্যাংকের নিকটে গুরুচরণ দাসগুপ্তের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস ও আসরব আলি। ১৯২৮ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান মাষ্টারদা সূর্যসেন তাঁর দুজন সঙ্গী নিয়ে হাইলাকান্দি এসেছিলেন। হার্টবার্টগঞ্জ বাজার নিবাসী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল আজীবন কংগ্রেসের সেবা করে গেছেন। তিনি সর্বদা খদ্দরেব ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করতেন—বিদেশি বস্ত্র বর্জনের পর থেকেই। মাস্টারদার সহকর্মী বিপ্লবী উপেন ধর, হেম নাগ এবং বর্তমান সরকারি স্কুলের তদানীন্তন হেডমাস্টার রাজকুমার সেনের দুই পুত্র সুনীল ও সুশীল রাজরোষে পড়ে গ্রেপ্তার হন। ঐসময়ে এঁরা ছাড়াও উপেন ধর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ পুরকায়স্থ, মদন ধর, প্রসুণ বসু, নৃপেন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গ্রেপ্তার বরণ করেন। সুশীল সেন

Scanned with CamScanner

ও উপেন ধরের ৭ বছর জেল হয়। ঐ জেলে থাকাকালীন সুশীল সেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। দেওঘর যড়যন্ত্র মামলায় সুশীল সেন উপেন্দ্র ধররা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতদঞ্চলের দায়িত্ব অর্পিত হয় সনৎ দত্তের উপর। স্বাধীনতা সংগ্রামী সনৎ দত্ত তাঁর কাকা জ্যোতিযচন্দ্র দত্তগুপ্তের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। হাইলাকান্দি সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুলে পড়াশোনাার সময়ই বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। শোনা যায় ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিমান বন্দরে বিমানে আগুন ধরে যায় এবং একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন বিপ্লবী উপেন্দ্র কুমার ধর। তিনি হাইলাকান্দি সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯০৪ ইংরাজিতে। ১৯২৪ ইংরাজিতে মেট্রিক পাস করার পর চট্টগ্রামে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই মাস্টারদা সূর্যসেনের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯২৭ ইংরাজিতে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় ৭ বৎসরের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে Quit India Movement এ জড়িয়ে পড়েন এবং নেতাজির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৯২৪ সালে বেঙ্গল অর্ডিনেন্সে গ্রেপ্তার এড়াতে উপেন্দ্রবাবু মাস্টারদাকে হাইলাকান্দি নিয়ে আসেন। একসময় উপেন্দ্রবাবু রেলের চাকুরিতে যোগদান করেছিলেন কিন্তু শহিদ ভগৎ সিং-এর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাকুরি ছেড়ে দেন। ১৯৮১ ইংরাজিতে 'ভারত সরকার' তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সন্মানিত করেন। ১৯৮৪ ইংরাজির ১১ আগস্ট এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়।

হাইলাকান্দি শহরের অদূরে গ্রাম বোয়ালিপার চৌধুরী বাড়ির এক সন্তান ক্যাপ্টেন মন্মথনাথ চৌধুরী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত INA -এর Capt. Rank এ ছিলেন। নেতাজীর INA ফৌজ ইম্ফল ছেড়ে চলে আসার সময় ভারতজননীর এই সুসন্তান মন্মথনাথ চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। তাঁরই কাকা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির জন্য জমিদান করেছিলেন। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন হাইলাকান্দি থেকে ইংরাজিতে প্রথম M.A. হাইলাকান্দির আরেক সুসন্তান স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি হলেন আব্দুল মতলিব মজুমদার। ১৮৯০ ইংরাজিতে হাইলাকান্দি শহরের নিকটবর্তী বড়জুরাই গ্রামে তার জন্ম হয়।

Scanned with CamScanner

১৯১৫ ইংরাজিতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। তিনি Intermediate Arts – ১ম বিভাগে এবং B.A. (Honours) –১ম বিভাগে ঢাকা থেকে পাশ করেন। তারপর ইংরাজি সাহিত্যে এম এ (১৯২১) এবং বি, এল (১৯২৪)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯২০ ইংরেজি থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন—বিশেষ করে Khilafat আন্দোলনে যোগদান করেন। ঐ আন্দোলনে তিনি ছাড়াও হাইলাকান্দির মজরক আলী, গুরুচরণ দাস, উপ্পর আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯২৫ ইংরাজিতে আব্দুল মতলিব মজুমদার হাইলাকান্দিতে আইন ব্যবসা সুরু করেন এবং ঐ সময়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি হাইলাকান্দি টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং লোকাল বোর্ডের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান। তিনি পরে তিনবার বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে দেশসেবা করে গেছেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিরহংকার পুরুষ ছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সময়েই শহরের হার্টবার্টগঞ্জ বাজার বয়কট করে মাদ্রাসার নিকট একটি বাজার চালু করে বিদেশি কাপড় পুড়ানো হয়। মৌলভী মনোহর আলী ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আব্দুল মতলিব মজুমদার ১৯৮০ ইংরাজির ২০ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

১৯২৯ ইংরাজিতে সদয় গোবিন্দ দাস হাইলাকান্দিতে প্রথম কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। ব্রিটিশের আইন অমান্য করে তিনি তাঁর বাড়িতে—যেখানে কংগ্রেসের সদর দপ্তর ছিল—সেখানে কংগ্রেসের তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

তখনকার সময়ে ভারতের চতুর্দিকে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। হাইলাকন্দিতেও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ননী চৌধুরী, অপূর্ব বিশ্বাস, শচীন রায় চৌধুরী, গুরুপ্রসন্ন চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং কারাবরণ করেন। আইন অমান্যকারী যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সদয় গোবিন্দ দাস, ননী গোপাল চৌধুরী, দেবেন্দ্র দত্তগুপ্ত, বিপিন চন্দ্র নাথ, অপূর্ব বিশ্বাস প্রমুখ আরও অনেকেই ছিলেন। ১৯৩৭ ইংরাজিতে লোকাল বোর্ড নির্বাচন হয় এবং এতে অংশ গ্রহণ করেন সুরেশ চন্দ্র পাল ও সুনীল চক্রবর্তী। ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হাইলাকান্দিতে পদার্পণ করেন এবং এখানে এক জনসভায় ভাষণ দান করেন। প্রথমে ক্যাপ্টেন সুবোধ দত্তের বাড়িতেই নেতাজিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করা হয়। নেতাজির

Scanned with CamScanner

আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মতলিব মজুমদার।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) আন্দোলনেও হাইলাকান্দির স্বাধীনতা কর্মীরা এগিয়ে এসে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করেন। আন্দোলনকারী জনগণ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। সদয় গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্র দত্তগুপ্ত, শচীন রায় চৌধুরী প্রমুখ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এমনকি নিকটবর্তী চা-বাগান এলাকাতেও ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে হাইলাকান্দিতে ছাত্র কংগ্রেস গঠিত হয়। দীপক রায়, অজিত ধর, কামাখ্যা দেব, বিনয় ভূষণ চৌধুরী প্রমুখরা ছিলেন তার সদস্য। ওয়াতির আলী নামে এক মুসলিম যুবকও আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সনৎ দত্তের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর কাকা জ্যোতিষ দত্তগুপ্তের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। ১৯২৬ ইংরাজিতে সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভ করে মেট্রিক পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর' দলে যোগ দেন। তিনি দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যান।

১৯৩৭ ইংরাজিতে হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি হন আব্দুল মতলিব মজুমদাব, সহ-সভাপতি হন নগেন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদক সুবোধ দত্ত এবং সহ-সম্পাদক হন সদয় গোবিন্দ দাস। সে সময় বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মজরফ আলী লস্কর ও হীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। হীরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সাদুল্লা মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু হাইলাকান্দিতে আগমন করেন। খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় চার ছাত্রী তাকে মাল্যদান করেন—এঁরা হলেন প্রীতি, প্রণতি, ঝর্ণা ও বাসন্তী। রাত প্রায় ৮ টায় সভা মঞ্চে শ্রীনেহেরু বক্তৃতা দিতে উঠেন। ভাযণে তিনি ভারতবর্ষের তৎকালের রাজনৈতিক অবস্থান, স্বাধীনতার পেক্ষাপট তৈরি সহ কংগ্রেস সমর্থিত জমিয়ত-উলেমা হিন্দের প্রার্থী

Scanned with CamScanner

আব্দুল মতলিব মজুমদার ও কংগ্রেস প্রার্থী বিদ্যাপতি সিংহের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেস কর্মীরা শ্রী নেহেরু ও তাঁর সঙ্গী শ্রী অরুণ কুমার চন্দ মহাশয়দের বর্তমান সেন্ট্রাল রোডের নগেন্দ্রনাথ দে চৌধুরীর বাড়িতে চা পানে আপ্যায়িত করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আসাম বিধান সভার নির্বাচনে আব্দুল মতলিব মজুমদার ও বিদ্যাপতি সিংহ জয়লাভ করেন। আব্দুল মতলিব মজুমদার সাহেব গোপীনাথ বড়দলৈ মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী পদে আসীন হন। স্বাধীনতা লাভের পরেও আব্দুল মতলিব মজুমদার মহাশয় মন্ত্রীরূপে দেশ সেবা করে গেছেন।

Scanned with CamScanner

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

রাজমোহন নাথঃ

হাইলাকান্দি শহরের নিকটবর্তী রাঙাউটি গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। হাইলাকান্দি সরকারি ভি এম হাইস্কুল থেকে ১৯১৯ ইংরেজিতে মেট্রিক পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। পরে সিলেটের M.C. College পড়াশুনা করেন। ১৯২৭ ইংরেজিতে আসাম সরকারের PWD বিভাগে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রূপে যোগদান করেন। সাহিত্য সংস্কৃতিতে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি Assam Literacy Conference 1958 এর সভাপতি ছিলেন। তিনি ইংরাজি, বাংলা অসমিয়া ভাষায় অনেক বই লিখে গেছেন। তার লেখা Nath's Handbook for Civil Engineering, Glorious Assam ইত্যাদি বই বহুল প্রচারিত। ১৯৫৬ ইংরাজির ৩রা এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন।

আব্দুল মতলিব মজুমদার ঃ

তিনি ১৮৯০ সালে হাইলাকান্দি শহরের নিকটবর্তী বড়জুরাই (উজানকুপা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারি ভি এম বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম

Scanned with CamScanner

বিভাগে উত্তীর্ণ হন, ঢাকা থেকে অনার্স সহ BA পাশ করেন এবং ইংরাজি সাহিত্যে M.A. পাশ করেন। ১৯২৪ সালে B.L.পাশ করে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে হাইলাকান্দি বার লাইব্রেরিতে উকিল হিসেবে যোগদান করেন। তিনি হাইলাকান্দি টাউন কমিটির প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আসাম বিধান সভায় পর পর তিনবার নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। পরোপকারী, মেধাবী এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন তিন।

প্রভাবতী রায়ঃ

জন্ম ঢাকায়। স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। হাইলাকান্দির জমিদার অবিনাশ চন্দ্র রায়-মহাশয়ের সাথে বিয়ের পর হাইলাকান্দি আসেন। হাইলাকন্দিতে এসে জনহিতকর, বিশেষ করে মহিলাদের উন্নতিকল্পে নানা কাজ আরম্ভ করেন। স্থানীয় মহিলাদের সহযোগিতায় ১৯২৮ সালে মহিলা সমিতি গঠন করেন — কলকাতার সরোজ নলিনী হরিমঙ্গল সমিতির শাখা হিসেবে। সমিতিতে মেয়েদেরকে সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি শেখানো হত। পরবর্তীকালে টাউন কমিটির উপসভাপতি তাঁর স্বামী অবিনাশচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় এক খণ্ড জমির ব্যবস্থা হয় এবং শিরিশপুর বাগানের ম্যানেজার মিঃ এ গ্রীভের অর্থসাহায্যে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত ছিলেন এবং তিনিই বোধ হয় হাইলাকান্দির একমাত্র মহিলা যিনি সারদা মায়ের সাথে দেখা করেন ও সঙ্গ লাভ করেন।

নীরজাবালা সেনগুপ্তাঃ

জন্ম ঢাকা শহরে। পিতা অখিলবন্ধু সেনগুপ্ত। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার যোগেন্দ্র কিশোর সেনগুপ্ত মহাশয়ের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর দু'জনেই হাইলাকান্দি চলে আসেন। শ্রীমতী নীরজবালা দেবী শিক্ষিত ও মার্জিত মহিলা ছিলেন। হাইলাকান্দি এসে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নজর দেন এবং হাইলাকান্দি শহরের তৎকালীন মেয়েদের M.E. স্কুলে যোগ দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি হাইস্কুলে

Scanned with CamScanner

উন্নীত হয়। তিনি হাইলাকান্দিতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এমন কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রীদের স্কুলে আনার জন্য অভিভাবকদের রাজি করিয়েছেন। প্রথমাবস্থায় নিজেই সব বিষয় পড়াতেন। ঐ স্কুল থেকে প্রথম ব্যাচ মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ছ'জন ছাত্রী পাশ করে বেরিয়েছেন।

এই শহরে শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ — অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন — যাঁদের নিয়ে হয়তো বা পত্র পত্রিকায় আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি ছিলেন এদের মধ্যে অনেকেই অতি সাধারণ — যাঁদের নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি বা ভবিষ্যতেই কেউ লিখবেন বলে মনে হয় না। এঁরা বিখ্যাত ব্যক্তি নন—রাজনীতি এঁদের পেশা নয়—কিন্তু আমাদের জন্য উল্লেখযোগ্য।

এই যে সাধারণ মানুষ — যাঁরা শিক্ষাদান করেন, লোকসেবা করেন, কেউ কেউ সব্জি ফলান। সুতো কাটেন ছবি আঁকেন। প্রতিমা গড়েন, পশুপক্ষী মানুষের চিকিৎসা করেন—তাঁদের মূল্য ইতিহাসে কতটুকু ? রাজায় রাজায় যুদ্ধ যেমন মিথ্যে নয়, তুচ্ছও নয়। তাঁদের কথা কে লিখবে? সেই সাধারণ—অথচ সামাজিক কাজের জন্য স্মর্তব্য — এমন কয়েকজনের কথা উল্লেখ করব।

খুকুমাসী (হেমলতা দাসগুপ্তা)ঃ

পারস্য দেশে মহিলাদের ইতিকর্তব্য বিষয়ে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ আছে — বইটির নাম "কিতাব কুলসুম্ নানঃ"। বইটিতে আছে যে সপ্তর্ষিস্বরূপা সাতজন গৃহমেধিনী ঐ কিতাবের নির্দেশিকা। আমাদের ভারতীয় সমাজে এর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। কারণ এমনতর মহিলারা আর গৃহকোনে আবদ্ধ নয় — রাজনীতি, সাহিত্য, ক্রীড়া ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান দখল করে রেখেছেন। এ শহরেই শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মহিলারা সমাজ জীবনে বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। যদিও দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের তুলনায় এঁরা অতি নগণ্য — তাঁদেরও একটা পরিচয় আছে—কিন্তু তা বৃহত্তর সমাজে জ্ঞাত নয়। তেমনি এক উৎসর্গীকৃত শিক্ষিকার কথা এখানে উল্লেখ করব— প্রাক্তন ছাত্রীরা অনেকেই

Scanned with CamScanner

এখনও তাঁকে স্মরণ করেন—অথচ তিনি শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্মানিত হননি—রাজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাননি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

মধুসূদন দত্তের ভাষায় "Heart of the Bengali Mother — মা তার শিশুটির জন্য যেরূপ স্নেহ, মমতা এ সহানুভূতি পোষণ করেন, সেরূপ শিশু, কিশোরীদের দৃষ্টিকে উন্মোচিত ও প্রসারিত করে দিতে — গৃহকোনে, সামাজিক শাসনে জর্জরিত নারীদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করতে যিনি তাঁর জীবন মন সমর্পণ করেছিলেন—যাঁর নাম আজ অবধি কোন সরকারি বেসরকারি শিক্ষামূলক প্রবন্ধে স্থান পায়নি — সেই মার্জিতরুচি করুণাময়ী নিষ্ঠাবতী শিক্ষাবিদ হাইলাকান্দি টাউন বালিকা বিদ্যালয়ের (বর্তমান নাম ইন্দ্রকুমারী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়) প্রাক্তন শিক্ষিকা প্রয়াতা হেমলতা দাসগুপ্তা—যিনি ছাত্রীদের কাছে খুকুমাসী বলেই খ্যাত (সমসাময়িকেরা খুকুদি বলেই ডাকত)। হাইলাকান্দিতে মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছেন — পুস্তক রচনা করেছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন — তেমনি তিনি হাইলাকান্দিতে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে — স্কুল প্রতিষ্ঠায়, শিক্ষাদানে বিস্তর সহযোগিতা করেছেন। অকাল বৈধব্য তাঁকে টেনে নিয়ে আসে শিক্ষা জগতে — তাঁকে আদর করে কাছে রেখে উৎসাহিত করেছেন তাঁর পিতা হাইলাকান্দি শহরে বিশিষ্ট মোক্তার, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব প্রয়াত বনমালী ধর। হেমলতা দাসগুপ্তা শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ঈশ্বর চিন্তায় ও আরাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজের চিঠিতে হেমলতা দাসগুপ্তাকে যে আশীর্বাণী লিখেছেন সেই চিঠির প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হল। তাঁর কর্মজীবনের পথটিও আত্মসৃষ্ট। শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন—"ভক্তিপূর্বক ভগবৎ নাম স্মরণ কর। তোমার পক্ষে যা কল্যাণকর হয় তা স্বয়ং ভগবান বিধান করিবেন। কোন কর্মেই ফললাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নহে। কর্তব্যবুদ্ধিতে অনলস ভাবে কর্ম কবিয়া যাও তাহাতেই যথার্থ শক্তির পথ খুলিবে......"।

প্রয়াতা দাসগুপ্তা আজীবন সেই উপদেশ মতো কাজ করে গেছেন। শেষ বয়সেও তিনি 'শিশুসদন ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুল প্রতিষ্ঠাতে সহযোগিতা করে গেছেন। ১৯৮৪ ইংরাজির জুলাই মাসের এক সূর্যালোকিত প্রভাতে তাঁর আত্মা

Scanned with CamScanner

বিলীন হয়ে যায় অনন্ত অসীম সত্তার মধ্যে। রেখে গেছেন আত্মীয় স্বজন অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমান লেখকের হাতেখড়িও তাঁর হাতেই।

মনু পীর ঃ

অনেক পীর ফকির আছেন যাঁদেরকে শুধু মসলমানরাই শ্রদ্ধা করেন — আবার অনেক পীরফকির আছেন যাঁকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন— তাঁর দোয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এমনই একজন পীরকে হাইলাকান্দি শহরে অনেকেই দেখেছেন বা তাঁর দোয়া লাভ করেছেন (বর্তমান লেখকসহ) এমন নির্লোভ স্বল্পবাক পীর যার চোখে জগৎ প্রেমময়, যিনি সংসারের সকল চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে। তিনি যত্র তত্র কোরানের বাণী শোনান না, উপদেশবাণী বর্ষণ করেন না অথচ তাঁর আলোক দীপ্ত চেহারায় ছিল প্রশান্তি। ইসলামের মূল কথা আল্লার উপর নির্ভরতা—পীর সাহেবের মুখমণ্ডলে তারই প্রতিফলন দেখেছি। তিনি সর্বদা কালো কাপড় পরিধান করতেন— পথিমধ্যে দেখা হলেই কপালের দু'দিকে দু'আঙুল টিপে ধরে ফুঁ দিতেন এবং বিড় বিড় করে কিছু বলতেন হয়তো বা কোরানের বাণী—সার্বিক মঙ্গল কামনায়। মানব কল্যাণের নিমিত্তই ধর্ম — পীর সাহেব মানুষের কল্যাণ কামনা করেই সবার জন্য 'দোয়া' আদায় করতেন। সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি — এটাই ছিল পীর সাহেবের মত। তিনি সেই বিখ্যাত মনুপীর যাঁকে হিন্দুমুসলমান সবাই ভালবাসত, সম্মান করত। তিনি পরিণত বয়সেই দেহ রক্ষা করেছেন। দুঃখের বিষয় তাঁর আসল নামটাই আমাদের জানা হল না।

এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ঃ

পুরোনো হাইলাকান্দিতে অদ্ভুত প্রকৃতির একজন লোকের কথা বলব — যাকে কেউই বিশেষ গুরুত্ব দিত না বা প্রয়োজনও পড়ত না—লোকটি তেমন কেউকেটাও নয় — অতি সাধারণ এক ব্যক্তি। ব্যতিক্রমী চরিত্রের জন্য তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। অনেকেই বিশেষ করে ছোট ছেলেরা তাকে পাগল বলেই ভাবত—আবার বড়দের অনেকেই তাকে সংসার

বিরাগী মানুষ বলেই মনে করত। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এক বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে ছিল বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—কম করেও পাঁচ ছ'খানা চশমা —(অনেকটা গান্ধীজির চশমার মত গোল ফ্রেমের) চোখে দিয়ে কাছারি কম্পাউণ্ডের উত্তর দিকে লম্বা ঘরের দিকের বারান্দায় (বর্তমানে ঘরটির সংস্কার সাধন হয়েছে) অফিসের সময় সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা অবধি দরজার পাশে বসে থাকতেন এবং বিড় বিড় করে 'গাডোয়ান' - 'গাডোয়ান' জপতেন। আমরা ছোটরা খেলার মাঠে যাবার পথে তাঁর দর্শন করতাম—বিশেষ করে পাশে একটা বড় আমগাছ ছিল, বর্ষায় গাছটায় প্রচুর আম ফলত আর আম খাওয়ার জন্য যেতাম। তার এই 'গাডোয়ান', গাডোয়ান' কথাটার অর্থ বুঝতাম না। ওকে জিজ্ঞেস করবো — সে সাহসটুকুও আমাদের ছিল না—কারণ আমরা ওকে পাগলই ভাবতাম — যদিও উগ্র মনে হত না। অনেকদিন পর তার, ঐ কথাটার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়। কথাটা ছিল GOD IS ONE — অর্থাৎ GOD IS ONE কথাটাই তিনি GODONE বলে উচ্চারণ করতেন। যিনি আমাদের আদি পিতা — তিনি এক এবং অদ্বিতীয় — "যো দেবানাং নমধা এক এব" — বা "একংসদবিপ্রা বহুধা বদন্তি" — ঋক্‌বেদে সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্বগুলির উল্লেখ আছে—এ কথাটিই যিনি অহরহ বলতেন—তাঁকে কি আমরা পাগল বলতে পারি — না তাঁকে আমরা ভাবের পাগল বলব — দার্শনিক বলব।

ডাঃ যোগেন্দ্র কিশোর সেনগুপ্তঃ

সাইকেলে ব্যাগ ঝুলানো ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্যকান্তি চেহারার ভদ্রলোক ঢাকা থেকে কবে এসে হাইলাকান্দিতে বসবাস আরম্ভ করেছেন তার সঠিক সময় বলতে পারব না —তবে পুরোনো হাইলাকান্দিতে ডাক্তার বলতে লোকে যোগেন সেন ডাক্তার বুঝত। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাইকেলে করে গামগঞ্জে শহরে ঘুরে ঘুরে রুগী দেখতেন সদাহাস্যময় ডাক্তারটি। ব্যাগভর্তি ইঞ্জেকশন আর ওষুধ — এ যেন ব্যাগের মধ্যে গোটা ফার্মেসি। যখন যে ডাকত তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে হাজির। তাঁরই স্ত্রী প্রখ্যাত শিক্ষিকা নীরজা সুন্দরী সেনগুপ্তা।

Scanned with CamScanner

ডাঃ অমূল্য রতন সেনগুপ্ত ঃ

পোশায় ইনিও ডাক্তার — কিন্তু নিজ পেশা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন ইনি ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী এবং হাইলাকান্দিতে সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলও খুলেছিলেন। ইনি সাপ্তাহিক জনমত বলে একটি পত্রিকাও বের করেছিলেন। এছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন এবং রাজনীতিতে ছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত। অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

ডঃ শচীন্দ্র দাসগুপ্ত ঃ

তিনি MBBS ডাক্তার ছিলেন না — কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ছিলত তাঁর প্রভূত প্রসার। দিনরাত্রি সাইকেল করে দূর দূর গ্রামান্তরে যেতেন লোকের চিকিৎসার জন্যে।

ডাঃ কৈলাশ চক্রবর্তী ঃ

ইনিও ছিলেন পেশায় ডাক্তার যদিও আমাদের সৌভাগ্য হয়নি উনার সমাজ সেবা দেখার তাঁর অকাল বিয়োগে। তার ছেলেরা সবাই খেলাধূলার সাথে জড়িত ছিলেন।

ডাঃ উপেন্দ্র বিশ্বাস ঃ হাইলাকান্দির প্রখ্যাত কবিরাজ ছিলেন উপেন্দ্র বিশ্বাস।

তিনি বেশ সুনামের সাথেই আয়ুর্বেদিক ওষুধের মাধ্যমে প্রচুর রোগীর রোগ উপশম করেছেন। তাঁরই ছেলে বিশু বিশ্বাস নামকরা কবিরাজ ছিলেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দেব ঃ

বর্তমান বিবেকানন্দ রোড ও স্টেশন রোডের সংযোগ স্থলে যে হোমিও ফার্মেসি ছিল সেটাই ছিল প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের ফার্মেসি। তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। যেমন — তাঁর কাছে গিয়ে কোন ওষুধ

Scanned with CamScanner

এক ডোজ চাইলে তিনি রেগে যেতেন — এবং বলতেন আপনি কি ডাক্তার হয়ে গিয়েছেন? তবে তিনি সাত্ত্বিক ভাবে চিকিৎসা করতেন এবং বহুলোক তার চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন।

ডাঃ অবনী কুমার দত্তগুপ্ত ঃ

প্রথম জীবন তিনি স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের কর্মী ছিলেন। কিন্তু কোনও এক ব্যাপারে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সাথে মতভেদ হওয়ায় তিনি চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে লোকালবোর্ড অফিসের ঠিক উল্টোদিকে বিরাট এক স্টেশনারি দোকান খুললেন। পরবর্তীকালে নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং দোকানটি শেষ পর্যন্ত বিরাট এক এলোপ্যাথিক ফার্মেসিতে রূপান্তরিত হয় — দোকানটির নাম ছিল A.K. Dutta & Sons। যৌবনে তিনি হাইলাকান্দির প্রথম ফুটবল ক্লাব গড়েন। তিনি নিজেও খুব ভালো ফুটবলার ছিলেন। আগরতলার মহারাজার ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। তারই সুযোগ্য পুত্রদ্বয় রবীন্দ্র কুমার দত্তগুপ্ত—যিনি শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হীরেন্দ্র কুমার দত্তগুপ্ত — দু'জনেই ভালো ফুটবল খেলতেন।

ডাঃ ললিত মোহন দাসগুপ্ত ঃ

না — ইনি মানুষের ডাক্তার ছিলেন না — ইনি ছিলেন পশুর ডাক্তার । হাইলাকান্দি পশু হাসপাতালের এককালের নামী ডাক্তার ছিলেন—বাড়ি ছিল রামনারায়ণ ট্যাংকের পশ্চিম পাড়ে। নামের চেয়ে "পশু ডাক্তার" বললেই এক ডাকে তাঁকে সবাই চিনে ফেলত। পশুদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ তাঁকে করি তুলেছিল এক মহান কিংবদন্তী ডাক্তার। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী — "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" — এর জীবন্ত উদাহরণ।

প্রতাপ চন্দ্র নাথ ঃ

হাইলাকান্দি শহরের পাশেই নিশ্চিন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং হাইলাকান্দি

সরকারি ভি এম স্কুলে শিক্ষালাভ করে সিলেট এম সি কলেজ থেকে স্নাতক হন। শুনেছি তিনি এ উপত্যকায় যোগী সম্প্রদায়ের প্রথম স্নাতক। আমরা ১৯৪৬ সনে সরকারি ভি এম স্কুলে ভর্তির সময় তাঁকে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পাই। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং নানাবিধ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ইরপান আলী লস্কর ঃ

হাইলাকান্দি শহরের কেন্দ্রস্থলে বড় মসজিদের পাশে কারুকার্য খচিত কাঠের দেওয়াল দেওয়া এক বাড়িতে ইরপান আলী লস্কর থাকতেন। মূল বাড়ি শহরের উপকণ্ঠে নিতাইনগর গ্রামে। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই হাতি আসতে দেখা যেত— কারণ দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে তাঁদের কাঠের ব্যবসা ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে রেজাক আলী ভাল খেলোয়াড় ছিলেন পরবর্তী কালে বিদেশে বসবাস করেন। তাঁর দ্বিতীয় ছেলেও খেলাধুলা করতেন এবং স্কুল উত্তর সময়ে লন্ডনে গিয়ে বসবাস করেন।

মুইনীর (?) মা ঃ

উনি এক অখ্যাতা মহিলা। যার কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি যাওয়া আর টুকিটাকি কাজকর্ম করে দেওয়া। তাঁর আবাসস্থল ছিল মহিলা সমিতি (বর্তমান সারদা সংঘ)। মুইনীর মা নাম শুনলেই অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিত। তার কাজই ছিল মুখ্যত অবাধ্য শিশুদের শান্ত করা। অকাল বৈধব্যে ক্ষীণকায় হয়ে যাওয়া মহিলাটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সামনে দাঁড়ালে অনেক বয়স্ক ছেলে মেয়েও ভিরমি খেত। অনেক শিশুর কান্না— "মুইনীর মা আসছে"— বললেই থেমে যেত। অথচ কি শান্ত স্থির ছিল তার চরিত্র। সমগ্র দক্ষিণপাড়ায় (তখনকার সময়ে রাস্তা ঘাটের নামকরণ— উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া হিসেবেই হাইলাকান্দি শহরের পরিচিতি ছিল) মায়েদের সহায়িকা সেই মুইনীর মার আসল নাম জানা যায়নি। তবে শোনা যায় তার এক মেয়ের নাম ছিল মোহিনী—এই মোহিনীর মা-ই শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক উচ্চারণে 'মুইনীর মা'-তে পরিবর্তিত হয়েছিল। এ ধরনের কত মহিলাই শহরের আনাচে কানাচে ছিল — তারাই ছেলে

Scanned with CamScanner

মেয়ে জন্মের সময় মায়েদের আঁতুর ঘরের কাজ করত। ছোট বেলায় দেখা মুইনীর মার চেহারা এখনও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে।

শ্রী নগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ঃ

হাইলাকান্দিতে বসবাসকারী প্রাচীনদের মধ্যে নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। জন্ম ১৯০০ ইংরেজিতে। সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা (Matriculation Examination) পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থে সিলেট যান। সিলেট মুরারি চাঁদ কলেজ (M. C. College) থেকে বি. এ পাশ করে আইন পড়ার জন্য কলকাতায় চলে যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে ১৯২৬ ইংরেজিতে হাইলাকান্দিতে উকিল হিসেবে বার লাইব্রেরিতে যোগদান করেন। তিনি হাইলাকান্দিতে উকিল হিসেবে বার লাইব্রেরিতে যোগদান করেন। তিনি হাইলাকান্দি শহরের নানা সামাজিক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমান ইন্দ্রকুমারী স্কুল যখন প্রাথমিক স্কুল থেকে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত হয়, সে সময় তিনি স্কুল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ ইংরেজিতে তিনি হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ ইংরেজিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন নির্বাচন উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দিতে আসেন সেবার সভাশেষে নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতেই তাঁকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। সেবার তিনি কংগ্রেস দলের নির্বাচন প্রার্থী বিদ্যাপতি সিংহের সপক্ষে নির্বাচনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে প্রচুর পরিশ্রম করেন। ভোট প্রচারের পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বৎসরই (১৯৪৬ ই) পরলোক গমন করেন। তিনি এলাকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী এবং বাগ্মী পুরুষ ছিলেন।

যতীন্দ্র মোহন ধর ঃ

বর্তমান লেখকের পিতৃদেব। পেশায় ছিলেন উকিল। কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করে ১৯২৭ ইংরাজিতে হাইলাকান্দি বার লাইব্রেরিতে যোগদান করেন। যৌবনে তিনি ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং হাইলাকান্দি

Scanned with CamScanner

দলের হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় খেলেছেন। তাঁর মস্ত গুণ ছিল যে অভিনয় খুব ভাল করতেন। শুনেছি তাঁর অভিনীত পৃথ্বীরাজ নাটকে পৃথ্বীরাজের নাম ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। সমাজ জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক — ওকালতি ব্যবসা করেও মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। শ্রীশ্রী স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী মহারাজের স্নেহধন্য ছিলেন—এবং বাড়িতে তিনি কয়েকবার এসেও ছিলেন।

হরসুন্দর চক্রবর্তী ঃ

হাইলাকান্দি বার লাইব্রেরির সফলতম উকিল ছিলেন হরসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলেন — কোর্টে তাঁর উপস্থাপনা এমনই ছিল যে অনেক ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন এবং তাঁকে হাইকোর্টে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন — কিন্তু তিনি হাইলাকান্দি ছেড়ে যাননি। তামাক সেবন তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তখনকার সময়ে বার লাইব্রেরি অধর বলে একটি লোক কাজ করত — তার কাজই ছিল কলকেতে তামাক ভরে তৈরি করে রাখা — যাতে করে উকিলরা কোর্ট থেকে এসেই অধর অধর বলে চীৎকার করত তামাক সেবনের জন্য।

শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য ঃ

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁরই বোন লাবণ্যপ্রভা দেবী ছিলেন টাউন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা — তাঁকে সবাই লাবুদি বলেই ডাকত। ছাত্রীরা তাঁকে ভীষণরকম ভয় করত, আমরাও ছোট বেলায় তাঁর ভয়ে ভীত ছিলাম।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও হাইলাকান্দি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন যাঁদের অন্তত নামোল্লেখ প্রয়োজন মনে করি — যাঁরা জনজীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। সে সময়ে রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি সামাজিক জীবন এখনকার মত এত উত্তাল অবস্থায় ছিল না। এদের কিছু কিছু লোকের

Scanned with CamScanner

উদ্ধৃতি দিচ্ছি—এঁরা হলেন—ব্রজকান্ত গুহ (ICS), অশ্বিনী সেনগুপ্ত, পরাগ কৃষ্ণ দত্তগুপ্ত (উকিল), জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত (উকিল), দেবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস (নাজির), লোকেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী (দন্ত চিকিৎসক), হিমাংশু চক্রবর্তী (রায়সাহেব এস্টেটের ম্যানেজার), কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী (উকিল), মহেন্দ্র ভট্টাচার্য (উকিল), প্রমোদ চন্দ্র ভট্টাচার্য (টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন), মন্তাজ আলী লস্কর (উকিল), প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত (Manager Tripura Modern Bank), আমাদের শিক্ষক পক্ককেশ ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত সরকারি স্কুলের শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র পুরকায়স্থ, ভাল অভিনেতা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, ধরণীধর চৌধুরী, কামাখ্যা দাশগুপ্ত, নাজির দেবেন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি হলেন ব্রজকান্ত গুহ— হাইলাকান্দি থেকে প্রথম I.C.S. officer —বর্তমান বিবেকানন্দ রোডেই তাঁর বাড়ি ছিল।

যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডরকম বেড়ে গিয়েছিল — চালের মন ছিল প্রায় একশত টাকা — সরকারি রেশন-এর দোকান খুলল — প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ও রবি বিশ্বাস তা পরিচালনা করেছিলেন। এ ছাড়াও উকিল কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী ও মুহুরী অম্বিকা ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করছি।

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় স্থান

ব্রিটিশরা বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করে ১৭৬২ ইংরাজিতে। ঐতিহাসিকদের ধারণা কাছাড়ি রাজারা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হন ১৭৯০ ইংরেজিতে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১৮৩০ ইংরাজিতে মারা যান এবং তখন থেকে অর্থাৎ ১৮৩০ সন থেকে কাছাড় ইংরাজদের অধীনে চলে যায়। কাছাড়ি রাজত্বের সময় থেকেই সিলেটের বাঙালিরা বরাক নদীর উত্তর পাড়ে বসতি স্থাপন আরম্ভ করেন। সেই সময়েই (আনুমানিক ১৭০০-১৭৫০) বাঙালি মুসলিমরাও কাছাড়ে আসতে আরম্ভ করেছিল। অনেকের মতে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হাইলাকান্দিতে ইসলামধর্মী লোকের আগমন ঘটেছিল।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে হাইলাকান্দি শহরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিল। শহরে ধর্মীয় স্থান বলতে আদি কালীবাড়ি, শিববাড়ি, রামকৃষ্ণ মিশন, বারোয়ারি কালীপূজা অঙ্গন ও তিনটি মসজিদ ছিল।

আদি কালীবাড়িঃ

ঐতিহ্যবাহী হাইলাকান্দি আদি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ১১১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ইংরাজি ১৭০৭ সালে। শোনা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে এক কাহিনী জড়িত আছে। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেবী স্বপ্নে

Scanned with CamScanner

মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। সেই সময়ের দুজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলেন মহামহোপাধ্যায় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য, বেদান্তশাস্ত্রী। এঁদের বাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গে। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যান। দেবীর নিত্যপূজার ভার দিয়ে যান পণ্ডিত জগন্নাথ বাচস্পতি মহাশয়ের উপর। প্রথমাবস্থায় মাটির ভিটের উপর ছন বাঁশের আটচালা গৃহ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে ১৭৪৭-১৭৪৮ সালে চুন সুরকির দেওয়াল দিয়ে মন্দিরটি পুনর্নির্মিত করা হয়। ১৮৬৮-১৮৭২ সালে আবার মন্দিরের সংস্কার সাধন করা হয়। কংক্রিটের ঢালাই করা ছাদ ও পাকা বারান্দা সহ পাকা মন্দির নির্মিত হয়। জগন্নাথ বাচস্পতি (চক্রবর্তী) মহাশয়ের প্রয়াণের পর সর্বানন্দ ব্যাকারণতীর্থ মহাশয় দেবীর পূজাচর্নার ভারপ্রাপ্ত হন। সর্বানন্দ ঠাকুরের পর দেবীর প্রাত্যহিক পূজার্চনার জন্য তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণ শর্মা (চক্রবর্তী) নিযুক্ত হন। তিনি একজন শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী লোক ছিলেন এবং তাঁর কর্মদক্ষতার ফলে তিনি রাজ্য সরকারের সাব-কালেক্টর হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। এবং পরবর্তীকালে ই-এ-সি পদে পদোন্নতি হয়। তিনি কিংস ইন্ডিয়া (King's India) থেকে মেডেল সহ রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হন। প্রয়াত জগন্নাথ বাচস্পতি (চক্রবর্তী) বংশই হাইলাকান্দি শহরের প্রখ্যাত জমিদার বংশ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। রায় বাহাদুর হরিচরণ শর্মা (চক্রবর্তী) মহাশয়ই হাইলাকান্দি কালীবাড়ীর জমি দেবোত্তর হিসেবে অর্পণ করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হরকিশোর চক্রবর্তী কালীবাড়ির উন্নতিকল্পে প্রচুর জমি দেবোত্তর হিসেবে দান করেছিলেন। তাঁরাই কালীমাতার বেশভূষা সাজ সজ্জাদি ও অলংকারাদি ও তৎসহ পূজার সামগ্রী মন্দিরের সুষ্ঠু পূজার্চনার জন্য দান করেছিলেন। তিনি সরকারি বেসরকারি নানা জমিদারি কাজে ব্যস্ত থাকায় দেবীর জন্য একজন পূজারি নিয়োগ করেছিলেন। এই পূজারিই প্রয়াত রসেন্দ্র ভট্টাচার্য যিনি বহুদিন মন্দিরের সেবা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ঃ

হাইলাকান্দিতে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন সম্পাদক এবং হরসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন সভাপতি। শহরের নিকটবর্তী রাঙাউটি গ্রামের

Scanned with CamScanner

রমণচন্দ্র শর্মা পুরকায়স্থ এবং কুমুদচন্দ্র শর্মা পুরকায়স্থ তাঁদের জুত জমির ৩ পোয়া ৩ যষ্ঠি পরিমাণ জমি সেবা সমিতির নামে দান করে সমিতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। পরে বোয়ালিপারের প্রয়াত মহেন্দ্রচন্দ্র দে চৌধুরী মহাশয় পূর্বের দান করা জমির মালিকানা ক্রয় করে তৎসহ আরও ১ বিঘা ৫ কাঠা জমি দান করেন। একটি কাঁচা ঘর নির্মাণ করেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে মণ্ডপসহ পাকাঘর নির্মিত হয়।

কাছারী মসজিদ :

হাইলাকান্দি শহরের মধ্যভাগে কাছারীর নিকটবর্তী পূর্বতন ২ নং ওয়ার্ডে বাঁশবেতের ঘর নিয়ে প্রথমে এক মসজিদ স্থাপনা করেন এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলিম বাসিন্দারা। বড় হাইলাকান্দির গোলাম রাজা চৌধুরী নিজ খরচে একখানা পাকা মসজিদ তৈরি করবেন বলে রাজি হলে রাঙাউটির গোলাম মিয়া লস্কর ১৯০৭ সালের ২২ শে মার্চ ১৩১৩ বাংলা সনের ৮ চৈত্র দলিল করে ১ বিঘা ৬ কাঠা ২ ছটাক জমি পূর্বতন ২ নং ওয়ার্ডে মসজিদের জন্য দান করেন এবং গোলাম রাজা চৌধুরী তথায় বিরাট এক পাকা মসজিদ নির্মাণ করেন যা বর্তমানেও আছে।

পুরাতন বাজার মসজিদ :

পুরাতন বাজার এলাকায় বর্তমান এস এস রোডে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মৌলবি আব্দুল করিম লস্কর মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করেন। তাঁরই ছেলে সিকন্দর আলী লস্কর ওয়াকফনামা করে মসজিদ নির্মাণের জন্য ঐ জায়গায় মোট ১০ কাঠা ৪ ছটাক জমি দান করেন এবং তথায় অধিবাসীরা একখানা পাকা মসজিদ তৈরি করেন। সরকার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ রা জুলাই ঐ মসজিদের সরকারি কর রেহাই করে দেন।

Scanned with CamScanner

শনিবাড়ীঃ

যে শনিবাড়ীর কথা এখানে উল্লেখ করব—তা বর্তমান শনিবাড়ী নয়। বর্তমানে যেখানে জেলা উপায়ুক্তের ভবন, সেখানে আগে একটি পাকা একতলা বাড়ি ছিল—যাকে বলা হত ট্রেজারি বিল্ডিং। তার পাশেই থাকত ট্রেজারি অফিসের সুরক্ষা বাহিনীর জন্য ছনের চাল দেওয়া একখানা বাড়ি (বর্তমানে এস পি অফিস)। তথায় সুরক্ষা বাহিনীর লোকেরা প্রতি শনিবারে শনিপূজা দিতেন। বর্তমানে ঐ শনিবাড়ী মন্দির হয়েছে।

শিববাড়ীঃ

হাইলাকান্দি শহরের মধ্য ভাগে পুরোনো শিববাড়ী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে সম্ভবত ত্রিশ-চল্লিশের দশকেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের ভূমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁরা হলেন পার্বতী কাহার ও আচনী কাহার। শিলচর রোডের কাহার পরিবারের সদস্যরা ধর্মানুষ্ঠানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়। ঐ পরিবারের কিছু কিছু সদস্য হাইলাকান্দিতে যোগাযোগ রক্ষাকারী মোটর মালিক ছিলেন। তবে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে শিববাড়িতে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়—এক সন্ন্যাসী, যাঁকে সবাই কানা সন্ন্যাসী বলত (কারণ তাঁর এক চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল), তিনি আসার পর বেশ কিছু স্থানীয় লোক মন্দিরের উন্নতিকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রাথমিকভাবে শ্রীধর বিশ্বাস বলে এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তি মন্দিরের প্রাত্যহিক সেবার পরিচালনা করতেন। পরবর্তী কালে পুরাতন মন্দির ভেঙে নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে।

বারোয়ারি কালীপূজা অঙ্গনঃ

এস এস রোডে সারদা স্টোর্সের পাশে যে মন্দিরটি অবস্থিত (বর্তমান মঙ্গলধাম) সেটি ছিল বারোয়ারি কালীবাড়ি। সেখানে দুর্গাপূজা ও রক্ষাকালী পূজা অনুষ্ঠিত হত। এ ছাড়াও পুজোর সময় যাত্রাদলের যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হত।

Scanned with CamScanner

বাল্যস্মৃতি

হাইলাকান্দি শহরের পুরোনো ইতিহাস লিখতে লিখতে ভাবছিলাম নিজের বাল্যকালের কিছু কিছু কথা। তা আলাদা করে শেষের পাতায় সন্নিবিষ্ট করলাম। সত্য ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসও জড়িত—কাজেই তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৪২ ইংরাজির প্রথম ভাগে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গ্রেহাম পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন আমার স্বর্গত পিতা—আজ ভাবছি ১৯৪১ সনের কথা—তখন সে বোধ ছিল না—সময়টা সারা ভারত ব্যাপী 'ভারত ছাড়ো' (Quit India Movement) আন্দোলনে উত্তাল। দেশ তখন উত্তপ্ত। ব্রিটিশদের অত্যাচারে জনগণ জর্জরিত। একেবারেই বাল্য অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই যে উত্তাপ তার উপলব্ধি ছিল না—আন্দোলনের তীব্রতাও ততটুকু ছিল না যতটুকু ছিল বাংলায়।

স্কুলে দুটি লম্বা ছনের ঘর ছিল—ছাত্র সংখ্যাও বেশি ছিল না। (এখনকার মতো Co-education তখনও হয়নি)। শিক্ষকরা ছিলেন হরকুমার চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক, তজমুল আলী চৌধুরী, গজেন্দ্র চন্দ্র দে চৌধুরী, হরেন্দ্র কুমার দে এবং আরও দুজন ছিলেন, নাম মনে নেই। ঐ পাঠশালায় পাঠরত অবস্থায় ১৯৪৪/৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ব্রিটিশ সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে এ অঞ্চলে আসতে লাগল। AIR RAID PROTECTION FORCE আমাদের

Scanned with CamScanner

স্কুল দখল করে নেয়। আমাদের স্কুল চলে যায় বর্তমান বাজারের কালীবাড়ীর সামনে। সেখানে দুটি লম্বা ঘর ছিল—তাতে বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুল ঘর বানানো হল। পাঠশালার পাঠ শেষ করে ১৯৪৬ ইংরাজিতে সরকারি ভি এম বিদ্যালয়ে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হলাম—তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র নাথ। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কামিনীকুমার বর্ধন, পূর্ণচন্দ্র পুরকায়স্থ, আহমেদ আলী সাহেব, আব্দুল হান্নান (স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাকিস্থানে চলে গিয়েছিলেন)।

এঁরা ছাড়াও কিছু কিছু শিক্ষক ছিলেন যাঁদের নাম স্মরণ করতে পারছি না। ছোট, খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিলাম— Boys Club নামে একটি ছোটদের ক্লাব ছিল—তার মাঠটি ছিল বর্তমান নজরুল ভবন ও জেলা গ্রন্থাগার যেখানে সেই জায়গাটিতে। পাশে ছিল একটি পুকুর—যা ভরাট করে সরকারি কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। তখন প্রায়ই বাইরের বড় বড় যাত্রাদলের যাত্রাপালা মাঠে অনুষ্ঠিত হত। ছোটবেলায় মনে আছে আমার স্বর্গত বড়দার সাথে টিকিট করে (আমার টিকিট লাগেনি) বর্তমানে যেখানে DRDA অফিস সেখানে নট্ট কোম্পানীর যাত্রাপালা দেখতে গিয়েছিলাম—সেই প্রথম যাত্রাভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া শহরের ছোটখাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত টাউন হলে। হলের নামটা ছিল Lady Earle Town Hall। সম্ভবত কেনও ব্রিটিশ মহকুমা শাসক বা কমিশনারের স্ত্রীর নামে নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমান ইন্দ্রকুমারী গার্লস স্কুলের পেছনে—বর্তমানে যেখানে মহিলা কলেজ গড়ে উঠেছে—সেই বিস্তীর্ণ এলাকাটি ছিল ছোট ছোট ঝোপে ভরা জঙ্গল—দিনের বেলাও লোকে যেতে ভয় পেত—ওখানে নাকি দিনের বেলায় শেয়াল দেখা যেত। সন্ধেবেলায় অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে (ইলেকট্রিক বাতি ছিল না) শেয়ালের হুয়াক্কা-হুয়া ডাকে চারিদিক মুখরিত হত। রাস্তাঘাটে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। টাউন কমিটির ব্যবস্থাপনায় শহরে স্থানে স্থানে লোহার স্তম্ভের উপর কাঁচের বাক্সে কেরোসিন বাতি জ্বলত। টাউন কমিটির এক কর্মী শহরে ঘুরে ঘুরে বাতিগুলোতে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিত। কোনও ঘোষণা থাকলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তা একটি লোক, নাম তার সহদেব মুঠি—ঢোল বাজিয়ে ঘোষণাটি বিকৃত বাংলা ভাষায় জানিয়ে দিত। যেহেতু লোকটি ছিল অবাঙালি, তার বিকৃত বাংলায় ঘোষণা শুনে লোকে হাসত। একবার নাকি শহরে কুকুরের উপদ্রবে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে টাউন কমিটি থেকে একটা ঘোষণা দেওয়া হল। সেই ঘোষণাটি সহদেববাবু বলতে বলতে পাড়া

Scanned with CamScanner

ঘুরতেন। ঘোষণাটি ছিল—'শহরবাসীর প্রতি আবেদন—যাঁদের বাড়িতে পালিত কুকুর আছে—সেইসব কুকুরের গলায় যেন বেল্ট বেঁধে দেওয়া হয়।' সেই ঘোষণাটি শ্রীমান সহদেবের মুখে বিকৃত ভাবে এভাবে শোনা গেল—'যার যার বাড়িত কুকুর আছে—তার তার গলায় বেল্ট বাধতে লাগব।'

স্বাধীনতার প্রাক্কালে আমাদের স্কুল জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় স্কুলে স্ট্রাইক করার কথা ছিল—কিন্তু প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকদের কড়া নিয়মে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে রামদাস নামে একটি ছাত্র অফিসে গিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় এবং ছাত্ররা বেরিয়ে আসে। পরে শুনেছি রামদাসকে নাকি স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট ১

হাইলাকান্দিতে নেতাজির আগমন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত মানপত্রের ফটো প্রতিলিপি

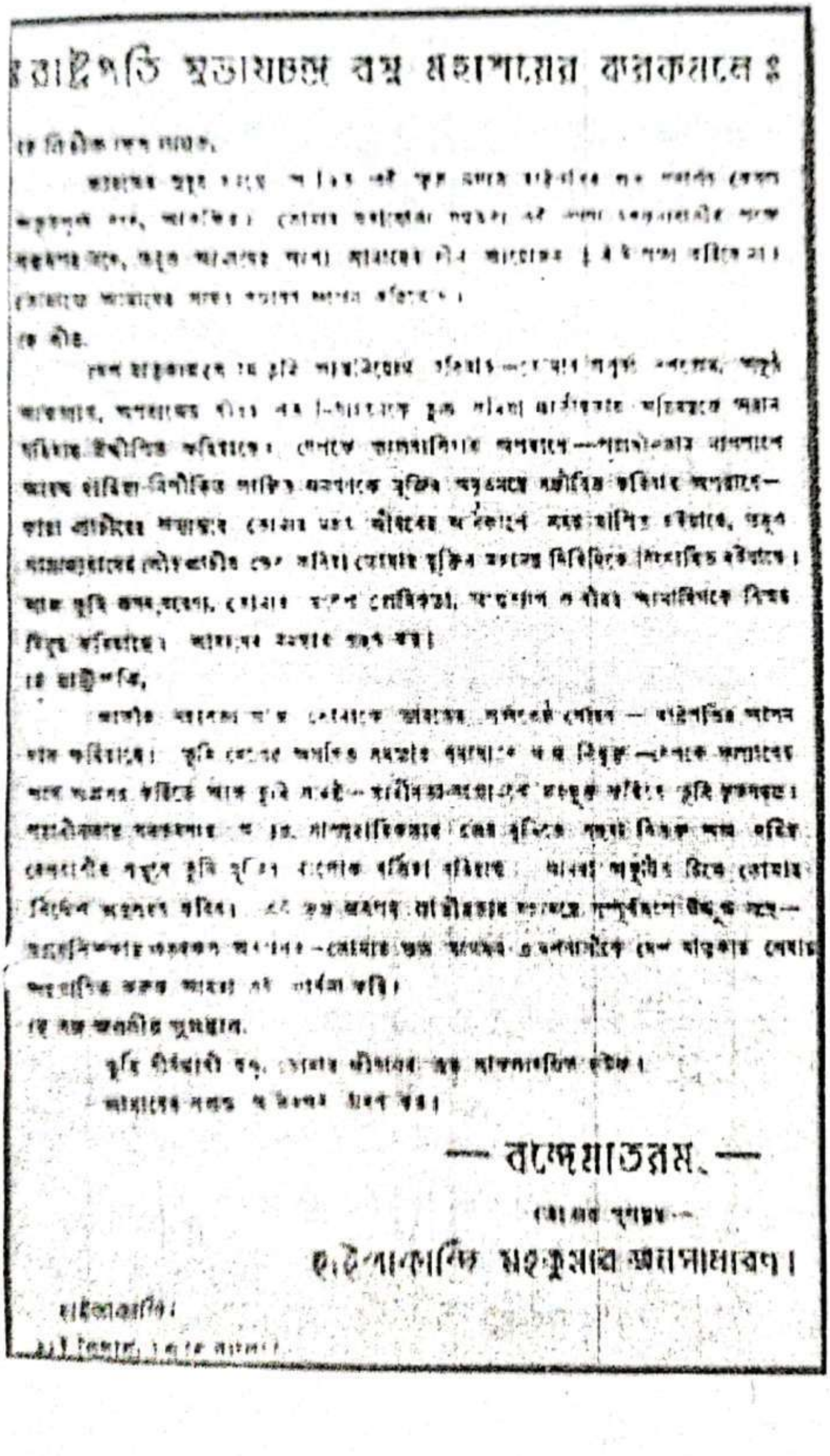

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের করকমলে

হে নির্ভীক দেশনায়ক,

ভারতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র নগরে রাষ্ট্রপতির শুভ পদার্পণ কেবল অভূতপূর্ব্ব নহে, আকস্মিক। তোমার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা এই নগণ্য মহকুমাবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, তবুও আমাদের আশা আমাদের দীন আয়োজন তুমি উপেক্ষা করিবে না। তোমাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

হে বীর,

দেশ মাতৃকার সেবায় তুমি আত্মনিয়োগ করিয়াছ—তোমার অপূর্ব্ব দেশপ্রেম, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ, অপরাজেয় বীরত্ব শত নির্যাতনকে তুচ্ছ করিয়া জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রকে অম্লান গরিমায় উদ্দীপিত করিয়াছে। দেশক ভালবাসিবার অপরাধে—পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ দারিদ্র্য-নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণকে মুক্তির অমৃতমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবার অপরাধে—কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তোমার মহৎ জীবনের অধিকাংশ সময় যাপিত হইয়াছে, তবুও সাম্রাজ্যবাদের লৌহ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার মুক্তির মহামন্ত্র দিগ্বিদিকে বিঘোষিত হইয়াছে। আজ তুমি জগদ্‌বরেণ্য, তোমার স্বদেশ প্রেমিকতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছে। আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর।

হে রাষ্ট্রপতি,

জাতীয় মহাসভা আজ তোমাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব—রাষ্ট্রপতির

Scanned with CamScanner

আসন দান করিয়াছে। তুমি দেশের অগণিত সমস্যার সমাধানে আজ নিযুক্ত— দেশকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে আজ তুমি সচেষ্ট—স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে তুমি কৃতসঙ্কল্প। পরাধীনতার ঘন তমসায় আচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার ভেদ বুদ্ধিতে বহুধা বিভক্ত অজ্ঞ দরিদ্র দেশবাসীর সম্মুখে তুমি মুক্তির আলোক বর্তিকা ধরিয়াছ। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্ত তোমার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিব। এই ক্ষুদ্র জনপদ জাতীয়তার মহামন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ নহে—স্বাদেশিকতায় এতদঞ্চল অনগ্রসর—তোমার শুভ আগমন এদেশবাসীকে দেশমাতৃকার সেবায় অনুপ্রাণিত করুক আমরা এই প্রার্থনা করি।

হে বঙ্গ জননীর সুসন্তান,

তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার জীবনের ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হউক।

আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

—বন্দেমাতরম—

তোমার গুণমুগ্ধ

হাইলাকান্দি মহকুমার জনসাধারণ

হাইলাকান্দি

১১ই বৈশাখ, ১৩৪৫ বাংলা।

পরিশিষ্ট ২

হেমলতা দেবীকে লিখিত সন্তদাস বাবাজীর চিঠি

১

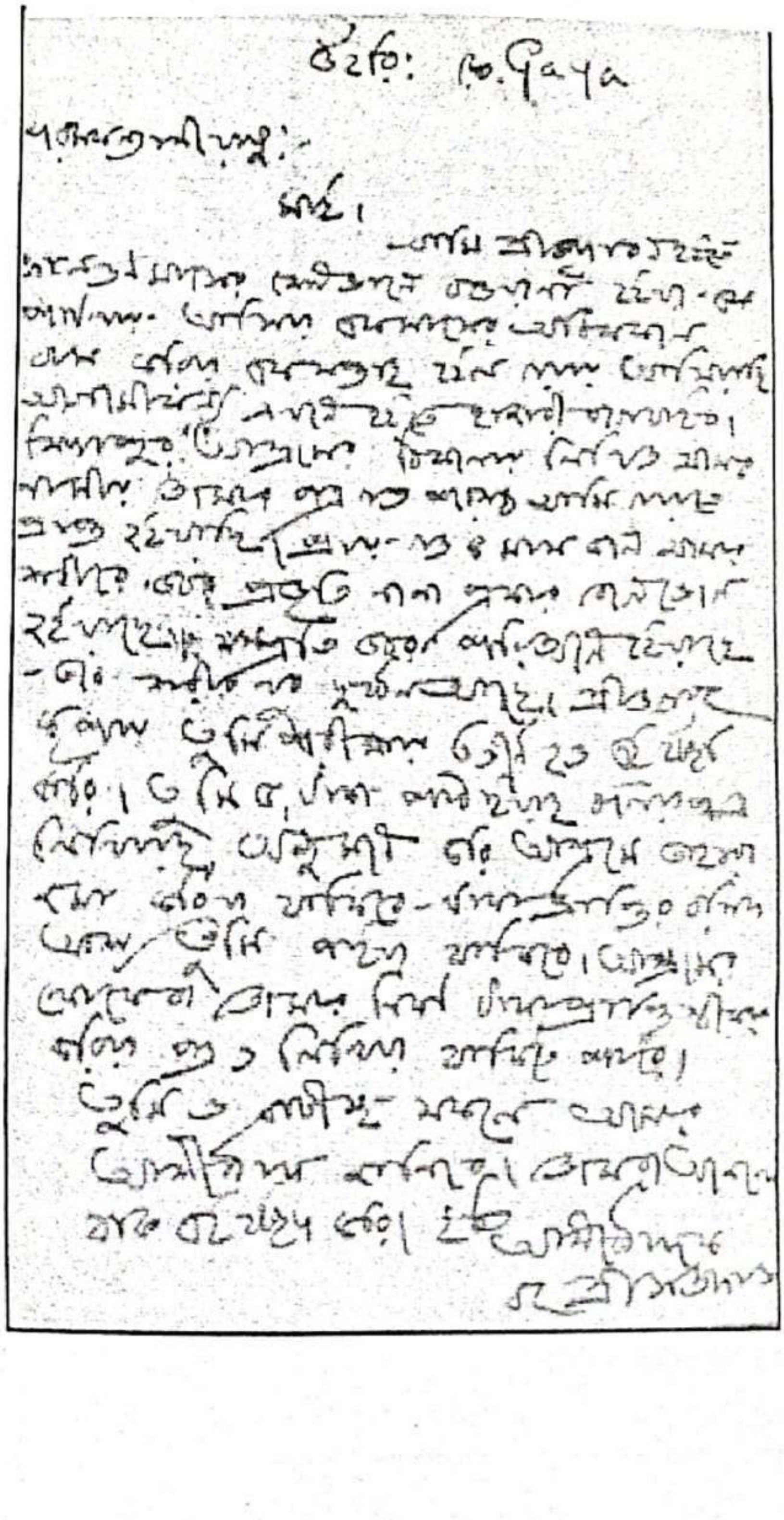

Scanned with CamScanner

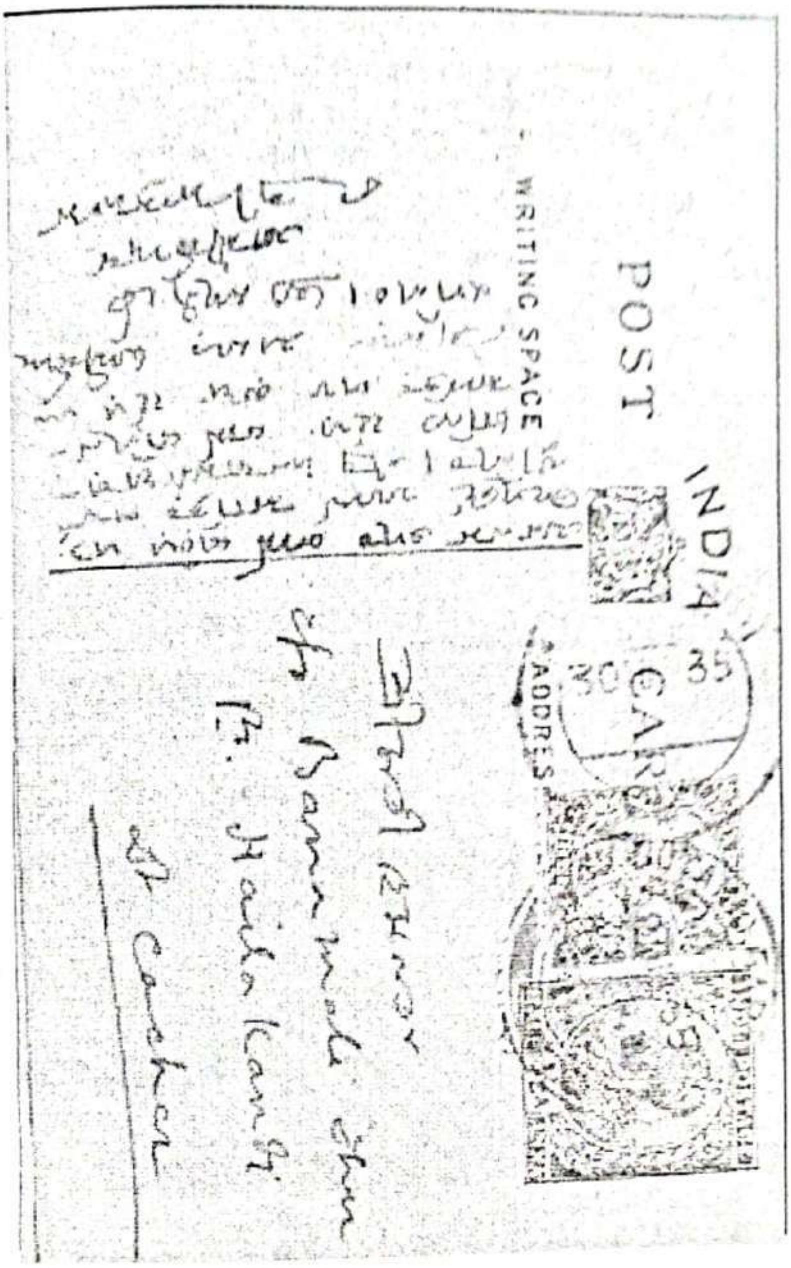

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট ৩

হাইলাকান্দির একটি শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান

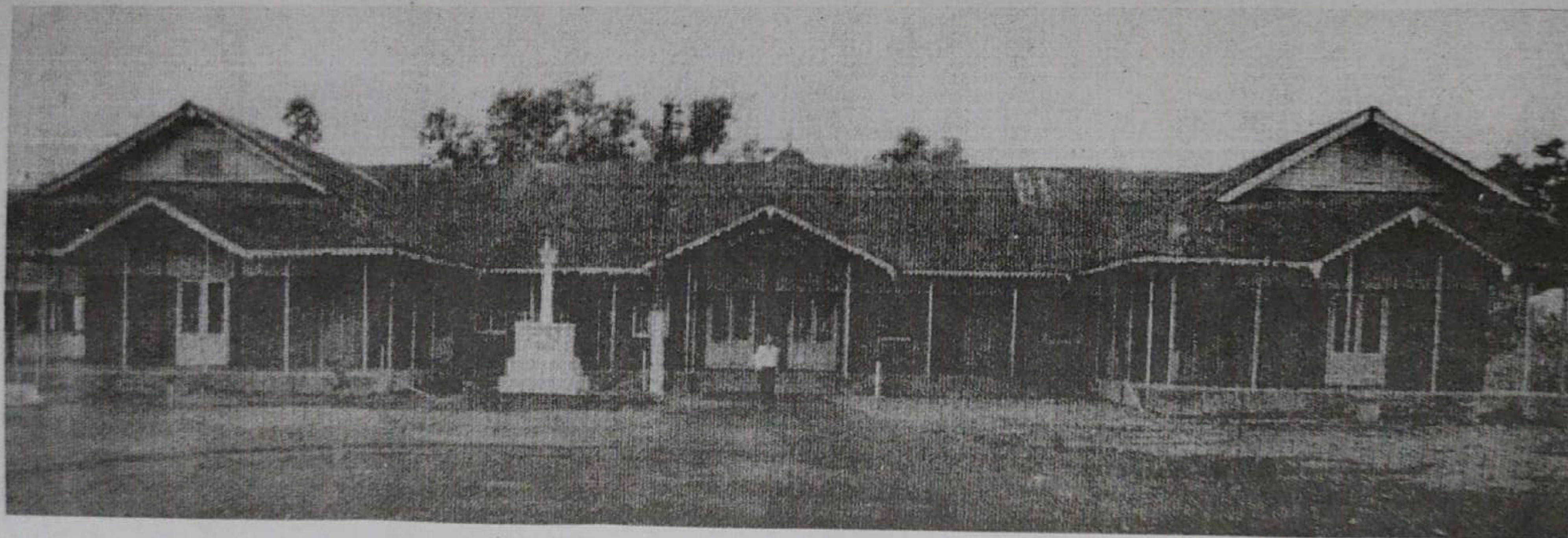

সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়

Scanned with CamScanner

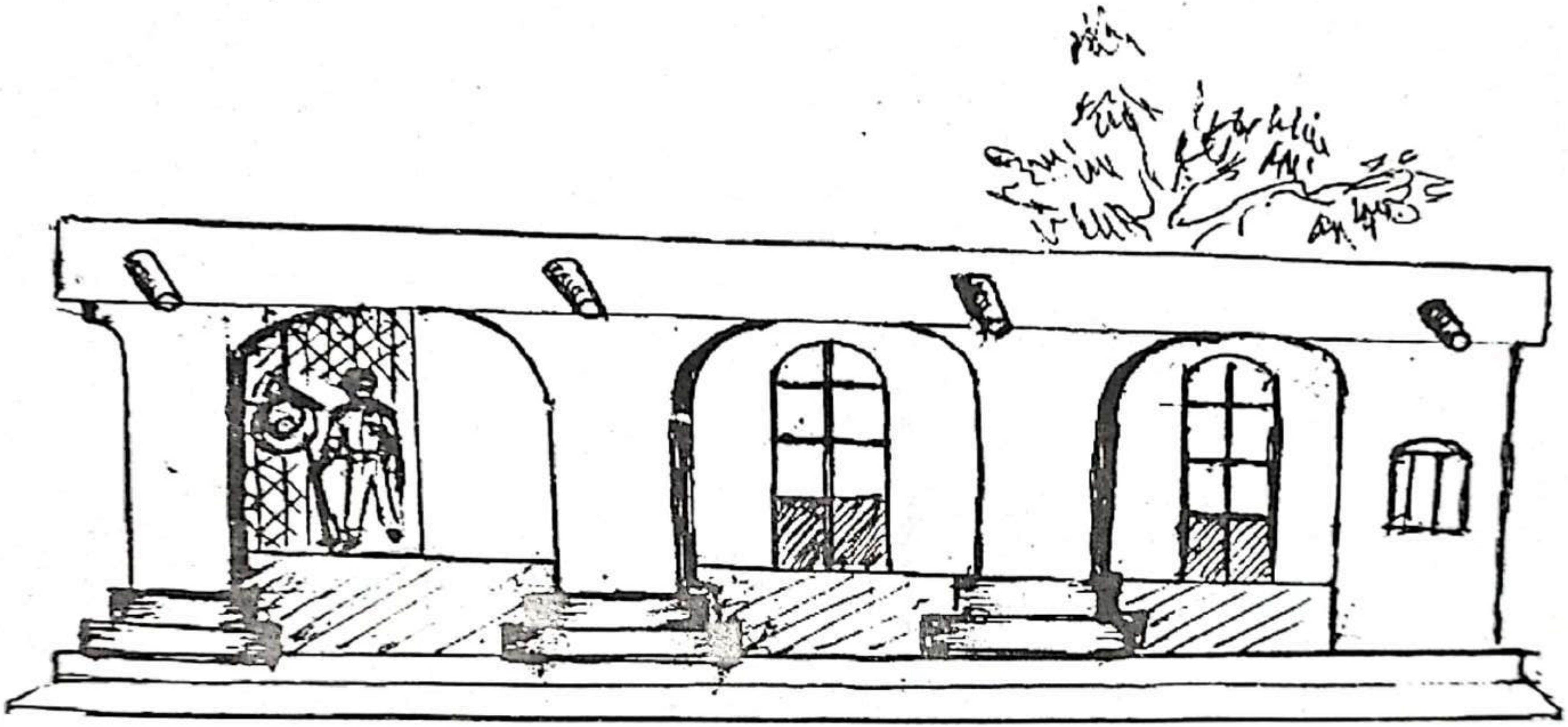

শিল্পী নীহারেন্দু চৌধুরীর তুলিতে পুরাতন ট্রেজারি বিল্ডিং

Scanned with CamScanner

হাইলাকান্দি শহরের মধ্যবর্তী এলাকা